যাদের মিলন হলো

রমেশ মজুমদার

ওরিয়েণ্ট লাইব্রেরী
১১৪ বি, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ১৯৫৯

প্রকাশক
শ্রীলাবণ্যময় দে
ওরিয়েণ্ট লাইব্রেরী
১১৪ বি, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫
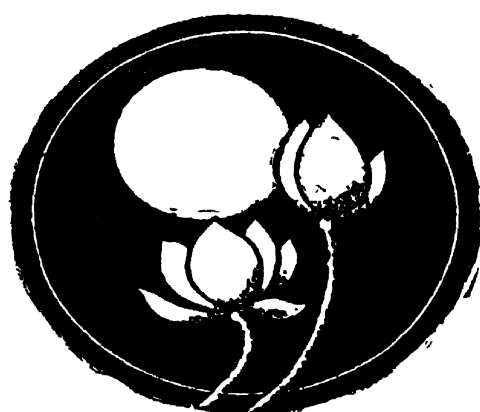
এঁকেছে, সেই সাথে ডজন পনেরো গল্পও লিপিবদ্ধ করেছে। শীঘ্র
নাকি প্রকাশিত হবে কিছু-কিছু।

মোহন সব শোনে। ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করে তার অন্তঃকরণ। অবশেষে একদিন আর স্থির থাকতে পারলো না। প্রকাশ করে ফেললে বললে—রবীনবাবু একটা ভাল কাহিনী আপনাকে আজ বলছি, আপনি লিখতে পারবেন? অবশ্যই লিখবেন আশা করি।

বলুন, চেষ্টা করবো! না পারবার কথা নয়।

মোহন একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো। চিন্তা সাগরের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হলো। একটু পরেই সে ফিক্ করে হেসে ফেললো।

—ভগবানের নামে শপথ করে বলুন, কাউকে বলবেন না!

—না! হেসেই উত্তর দেয় রবীন।—বিশ্বাস করুন!

এর বেশী আর কিছু বলবার অবকাশ দিল না মোহন। প্রকাশ না করা পর্যন্ত তার শান্তি নাই। বললে ভাল করে চারিদিকটা লক্ষ্য করে—এর আগে আমি যে অফিসে ছিলাম, সেই অফিসের যিনি বড়বাবু ছিলেন তাঁর নাম অরূপবাবু। বাসা ছিল অফিসের কাছেই। থাকতেন ভাই ও বৌ ছেলে-মেয়ে সহ। বড়মেয়েটি সে সময় পড়তো নবম শ্রেণীতে। তার বড় ভাইটি অতি অল্পবয়সেই বি-এ দিচ্ছিল। ছোট মেয়েটি পড়তো ষষ্ঠ শ্রেণীতে। যাক সে সব, বড় মেয়েটির নাম মাধবী। বলতে-বলতে মৃদু হেসে থেমে পড়লো মোহন।

টেবিলের উপর টেলিফোনটি বেজে উঠলো। রিসিভারটা রবীন তুলে নিতেই তার হাত থেকে মোহন কেড়ে নিলে। সকৌতুকে বলে—হ্যালো! কে! ও, তুমি! হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই মাত্র বলতে আরম্ভ করেছি। তারপর, তোমার খবর কি! শরীর ভাল আছে তো? উনি লিখবেন বলেছেন। না-না, ভয় নেই, রবীনবাবু সেরকম নয়! মানুষ দেখলেই বুঝা যায়।—

এর পর আর যেকথা শুনা গেল, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই মেয়েটি সিনেমার টিকিট কেটেছে এবং মোহনকে আধঘণ্টার ভেতর নির্দ্দিষ্ট 'হল'এ উপস্থিত হতে বলছে।

মোহন হেসেই রিসিভারটি নামিয়ে রেখে বললে—আজ আর বলা হলো না, রবীনবাবু। এখুনি আমাকে যেতে হবে। যার কথা বলছিলাম, সেই ফোন্ করেছে। সুতরাং আগামী কাল সব বলবো! তবে এইটুকু জেনে রাখুন যে সেদিন যে মিষ্টি খেলেন, সেগুলি পাঠিয়েছিল এই মাধবী। বলে একচোট গর্ব্বের হাসি হাসলো মোহন। যেন সে একটা বিরাট কিছু জয়লাভ করে ফেলেছে। এমনি তার উচ্ছ্বাস আর ভাব।

রবীনও অবাক হলো। হাঁ করে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। এওকি সম্ভব! .

—আচ্ছা, তবে আসি। চলে গেল মোহন হাসতে-হাসতে। রবীন ভাবে, শুধুই ভাবে। ছুনিয়াটা কি রসাতলে যাবে! শুধু প্রেম আর প্রেম! কিন্তু খাঁটী প্রেম আর কটা দেখা যায়! সবই যে ভেজাল। প্রায় সবারই পেছনে দেখা যায় একটা ঘৃণ্য লালসা জাজ্বল্যমান। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই দেখা যায় এমনি ধারা হাজার ছবি। পথে ঘাটে, মাঠে, পার্কে, প্রেক্ষাগৃহে, উৎসবে সর্ব্বত্রই চলছে প্রচণ্ড মাতামাতি। কেন? সমাজের কি ধ্বংসের সময় হয়েছে? এর শেষ কোথায় কে জানে? হয়তো এরই মাধ্যমে সমাজের ধ্বংস সূচিত হবে।

নারীরাই সৃষ্টি করে, স্থিতি করে, আবার সেই এনে দেয় ভাঙ্গন। কে বুঝতে পারে তার মহিমা? কে বোঝে তার কথা?

পরদিন দশটায় অফিস বসতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। রবীন তুলে ধরে রিসিভার। মোহন তখনও আসেনি।

—হ্যালো? উত্তর দিলে রবীন।

—হ্যালো! কে বলছেন? প্রশ্ন এলো অপর দিক থেকে।

—রবীন কথা বলছি।

—ও নমস্কার,? আপনার সাথে কথা বল্‌তে পেরে গর্ব্ববোধ করছি। মোহন আসেনি এখনও? কোথায় গেল?

রবীন বুঝলো এই মেয়েটিই সেই মাধবী, মোহনের মানসী।

—না, এখনও আসেননি ! হয়তো এখুনি আসবেন।

—কিন্তু—আমার সাথে কলেজের সামনে এই ঠিক সাড়ে দশটায় দেখা করবার কথা ছিল। এখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। কি ব্যাপার বলুন তো ? আপনাকে কিছু বলে গেছে কি ? অদ্ভুত লোকটা।

—না, কিছুই তো বলেন নি ? উত্তর দেয় রবীন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটি বললে—আচ্ছা, শুনুন, এলে বলবেন, ঠিক চারটের সময় ইডেন গার্ডেনে আমার সাথে যেন দেখা করে। ভুলবেন না যেন। তাহলে বিপদে পড়বো।

—না—না, ভুলবো না।

তারপর নমস্কার জানিয়ে রবীন রিসিভারটি রেখে বেশ একটু হাসলো।

এগারোটা বাজতেই মোহন এলো। মুখে হাসি। বললে—কোন খবর আছে রবীনবাবু ?

রবীন মুচ্‌কি হেসে বললে—অবশ্যই আছে ! আপনার সাড়ে দশটায় দেখা করবার কথা ছিল, যাননি। তাই তিনি ফোন্ করলেন সাড়ে দশটায়। জিজ্ঞাসা করলেন খবরাখবর। দুঃখ করলেন তিনি।

—তাই নাকি ! বাড়ীতে ছেলেটার জ্বর হয়েছিল, তাই যেতে দেরী হয়ে গেল। কলেজের সামনে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে দশটার বেশী। দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে চলে এলাম ! বললে মোহন।

মুহূর্তে রবীন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে অন্যত্র বিয়ে করেছে, অথচ আর একটি কুমারীর সাথে প্রেম ! সে কি ! এও মেনে নিল মাধবী ?

—হ্যাঁ। চারটের সময় ইডেন গার্ডেনে দেখা করবেন।

মোহন হাসলো। বললে—আমি ওকে কাল বলে দিয়েছি যে, যদি কোন খবর আদান-প্রদান করবার দরকার থাকে রবীনবাবুকে নিঃসন্দেহে জানাতে পারো ! বুঝেছেন তো ?

—সেকি ! আমাকে বিশ্বাস করেন ?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

দুপুরে 'টিফিন আওয়াসে' মোহন ধীরে ধীরে সব ব্যক্ত করলো।

প্রেম তাদের জমে উঠেছে পাঁচ বছর আগে থেকে। তখন মোহন বিয়ে করেনি। আর মেয়েটি পড়তো নবম শ্রেণীতে। একদিন বিকালে মোহন অফিসের কতকগুলো পুরানো কাগজ-পত্র বাইরে নিজে হাতে পুড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল বড়বাবুর মেয়ে মাধবী, আর এক চাক্‌রাণী।

মোহন স্বকর্ণে শুনেছে—চাক্‌রাণী বল্‌ছিল—এ ছেলেটিকে বেশ তোমার পছন্দ হয় দিদিমণি ?

—হুঁ। একটু হেসে অতি সন্তর্পনে জবাব দিয়েছিল মাধবী।

মোহন সে দিকে চাইলো। মেয়েটা সরে গেল না, তেমনি নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়েই রইলো। চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই হলো প্রথম সূত্রপাত। রেখাপাত করলো হৃদয়ে।

একদিন রবীন আড়ি পেতে শুনেছিল—একটী মেয়ে তার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করছে—"হ্যাঁরে, তুই করুণাবাবুকে অত করে খাওয়ালি কেন রে ?

সে উত্তর দিলে—লাভ না থাকলে কি আর সাধে—

—কী রকম লাভ! মানে, তিনি তোর প্রণয়প্রার্থী ? তারও বেশী ?

—সেটা যদি হয় মন্দ কি। তাছাড়াও তিনি হয়তো তাঁর দশ বন্ধুকে খুব ফলাও করে বলবেন ? তাতে ভাগ্যক্রমে ভালো বর মিলে যেতে পারে। একথাও ঠিক।

মাধবীও সেই পথের পথিক। ইচ্ছা রয়েছে, ভাল লাগছে। এগিয়ে যেতে দোষ কি। চাই সাহস, সেই সাথে বুদ্ধি। বুদ্ধি থাকলে সব হয়।

*

* *

মোহন তারপর দেখা করতে গিয়েছিল।

ঠিক চারটের সময় ইডেন গার্ডেনে দু'জনার সাক্ষাৎ হলো। মাধবীর এক হাতে কলেজের বই খাতা, আর এক হাতে চানাচুরের প্যাকেট। মুখে প্রচুর হাসি।

দু'জনে বসলো নিরালায়, একটা গাছের তলায়। ঠিক পাশাপাশি।

—তারপর—তোমার খবর কি? সকালে দেখা করলে না কেন? প্রশ্ন করে মাধবী। একটু ছিল তাতে অনুযোগ।

—ছেলেটার জ্বর হয়েছে কাল রাত থেকে। সারারাত কেঁদেছে। রাতে বৌটাতো ঘুমাতেই পারেনি। সকালে রান্না করতে তার দেরী হয়ে গেল, তাই ঠিক সময়ে আসতে পারিনি।

—ও? এখন কেমন আছে? কি খাওয়াচ্ছো?

—একই অবস্থা। তবে সত্যিই বৌ হয়েছে বড় ভালো। মুখে কথা নাই। যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। অত ধৈর্য্য, অত সহনশীলা দেখা যায় না। আমার উপযুক্তই হয়েছে। এ কথা ঠিক।

মাধবী একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল। মোহন তাকে যেন আঘাত করলো। জানিয়ে দিলে যে, তার বৌ সুপ্রিয়ার পাশে তোমাকে দাঁড় করালে মূল্য নেবে আসবে তোমার শূন্যস্থানে। সে তোমার চেয়ে কম শিক্ষিতা হলেও তোমার চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশি।

মাধবী মুহূর্তে বুকের সে ক্ষতস্থানে সান্ত্বনার মলম লাগিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। চানাচুর বের করে তার মুখের কাছে ধরে বললে—খাও! তোমার জন্যে কষ্ট করে এনেছি।

মোহন যেন একটু ঘৃণাভরেই মুখটা ফিরিয়ে নিলে।—কি এটা!

—চানাচুর এনেছি, খাও!

—না, পেটটা ভরে গেছে। 'ক্যান্টিনে' খেয়ে এসেছি। তার চেয়ে তুমি খাও। আমার ইচ্ছে নাই।

স্তব্ধ হয়ে গেল মাধবী। মাথা তার নত হয়ে এলো। মোহন তাকে চিরজীবন আঘাত দিয়েই যাবে! সে কি আঘাত দিয়েই সুখী হতে চায়! না—নিজের মূল্য বাড়াতে চায়? কিন্তু মূল্যই বা তার কতটুকু! বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, জ্ঞানে, কোন্ দিকে? কিন্তু সে তা বলে প্রতিশোধ নিতে চায় না। তাতে প্রিয়তম আঘাত পাবে। তার আঘাত সে সহ্য করতে পারবে না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে হাতের চানাচুরের প্যাকেট পড়ে গেল। ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়লো। সেদিকে তার বিন্দুমাত্রও খেয়াল নাই। বুকে তার ব্যথার জ্বালা।

সেদিকে নজর গেল মোহনের।—ওকি! ওগুলো নষ্ট করলে কেন?

যেন চম্‌কে উঠলো মাধবী।—কী!—ওঃ! যাক্‌, ভালই হয়েছে। তুমি যখন খেলে না, তখন আমিই বা কি করে খাই! তোমাকে নিজ হাতে খাওয়াতে পারবো আশায় কিনে এনেছিলাম।

—আমার জন্য এত পয়সা নষ্ট করতে গেলে কেন? আর আমি খাব কি না খাব—এ মতামতটাও কি নেওয়া উচিৎ ছিল না? মোহন পকেট থেকে দু' টাকার একখানি নোট বের্ করে মাধবীর কোলের উপর রাখলো।

মাধবীর চোখে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। টাকাটা সরিয়ে দিলে মোহনের দিকে। বললে—তুমি কি আমাকে টাকা দেখাতে এসেছো, মোহন! তুমি টাকা চেনো, ভালবাসা জানো না। আদর চাও, দিতে জানো না। আঘাত দিয়ে অপরকে পোড়াতে পারো, নিজে দগ্ধ হবে—এ কথাটা কখনও ভাবো না, কেন? মনে রেখো, আজ পাঁচবছর থেকে তোমাকে যে গভীর ভালবাসি, তা টাকার জন্য নয়, নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হবার আশায়। কিন্তু তুমি তার মর্যাদা দিতে জানলে না, মোহন। টাকা আমি না উপায় করতে পারি, কিন্তু বাবা করে থাকেন। আর তার পরিমাণ তোমার পাঁচগুণ।

মোহনও এতক্ষণে জ্বলে উঠেছে।—তাই যদি বুঝেছো, তবে এতদিন আমার পেছন ধরে আছো কেন? কি জন্য জবাব দাও?

—তা তুমি বুঝ্‌বে না, মোহন! প্রেমে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিন্তু তুমি আগল খোলনি। আমি অন্ধ হয়েছি, তুমি মুক্ত নয়নে উপেক্ষার দৃষ্টি হানছো। তুমি পাষাণ, তুমি নিষ্প্রাণ, স্বার্থান্বেষী, অথচ আমার দিকে তাকাওনি। ধ্বংস করতে এসেছো, সৃষ্টি করতে পারোনি। অদ্ভুত তোমার প্রেম।

—থামো—থামো, হয়েছে, আর 'লেকচার' দিতে হবে না।
ও সব শুনবার সময় আমার নেই, আমি চল্‌লাম। তুমি বকে যাও।

মোহন চলে যাচ্ছিল। ডাক্‌লো মাধবী।—মোহন! শো-
যেয়ো না; তোমার পায়ে পড়ি! যদি চলে যাও, তাহলে আম
আর দেখতে পাবে না এ জগতে!

থামলো না তার প্রিয়তম। মাধবী পাষানীর মত নিস্পন্দ প্রায়
মোহনের গতির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কাঁপতে লাগলে
দেহ। চোখ দুটি বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা। পদতল যে
কাঁপছে। নিজেকে আর সামলাতে পারছে না।

কয়েকমিনিট বাদেই মিলিয়ে গেল মোহন। মাধবীর অশ্র
তখনও ঝরছিল। সেখানেই বসে পড়লো ঘাসের উপর। নিজ
অদৃষ্টকে ধীক্কার দিল পুনঃ পুনঃ। কেন সে মরতে এসেছিল একে ভাল
করে না চিনে! এরা কেঁচো নয়, কেঁউটে। এরা মাতে না, মাতায়।
প্রেম করে ওজন রেখে, কিন্তু অপর পক্ষের ওজন রাখতে চায় না।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মাধবী উঠে দাঁড়ালো। পা বাড়ালো
গঙ্গার দিকে।

গঙ্গার ধারে গিয়ে ক্ষণেক দাঁড়ালো। ঝাঁপিয়ে পড়বার কয়েক
মুহূর্ত বাকী। পেছন থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—মাধবী,
দাঁড়াও, শোন, মাধবী!

চমকে উঠে ফিরে চাইলো সে। অবাক হলো। মোহন ছুটে
আসছে। হতভাগী পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলো। তার অন্ধকারময়
ভবিষ্যৎ মুহূর্তে যেন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। শুকতারা
দেখা দিল নীলাভ আকাশে। ঝড় থেমে গেল। ঐ তো আলো!

মোহন ছুটে এসে মাধবীকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলো।—
তুমি কি সত্যিই বিদায় নিতে চাইছিলে? কিন্তু কেন? আমি কি
কোন অন্যায় করেছি? সেটা কি আমারই দোষ আমারই ভুল।

কথা বলতে পারলো না মাধবী। তার মুখের দিকে চেয়ে
দেখলো মোহন। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঐ অশ্রু

নির্গত হচ্ছে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে। উৎস তার অন্তঃস্থলে। তাই হলো কণ্ঠরোধ। আজ কত দুর্ব্বল সে!

মোহন তার অশ্রু মুছিয়ে দিলে। মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—কথা বলো। নইলে আরো দুঃখ পাবো।

মাধবী বললে—আমার কথা তো তুমি শুনতে চাওনা! তোমার যে সময়ের অনেক দাম। কিন্তু সময়ের এ মূল্যটুকু যদি পাঁচবছর আগে বুঝতে, তাহলে আমার এই দুরাবস্থা হতো না। তুমিই আমাকে টেনে এনেছো, আজ তুমিই আমাকে নিয়ে খেলা করছো। তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আজ আমি উচ্ছিষ্টের মত উপেক্ষিতা,—কিন্তু কেন? উত্তর দাও, এর জন্য দায়ী কে? শুধু কি আমি?

—মাধবী, আজ আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করো!

—ক্ষমা। তুমিই বলো, একি ক্ষমা করবার, না ক্ষমা চাইবার! অথচ আমি চিরদিন তোমায় ক্ষমা করে এসেছি। কিন্তু তুমি মূল্য দিতে জানোনা। জেনেছিলে দু'বছর আগ পর্যন্ত! আজ দু'বছর বিয়ে করে তুমি আমাকে মাড়িয়ে চলেছো পথের ধূলো ভেবে, আর নববিবাহিতাকে রেখেছো মাণিক্যের মত। তুমি কি একদিন আমাকেও আশা-ভরসা দিতে কম করেছো, মোহন!

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। বললে—আজ আমাকে এত আঘাত না দিলেই কি চলতো না, মাধবী? বাক্যবাণ থামাও লক্ষ্মীটি।

—না, হয়তো জীবনে আর এমন অবকাশ পাবো না, তাই আজ বলে যাই। এই সামান্য কথাটুকু সইতে পারছো না, আর আমি নিশিদিন এত আগুন কি করে ধারণ করে বেঁচে আছি! তুমি চিরদিন নিজের দিকেই লক্ষ্য করেছো. আমার দিকে লক্ষ্য রাখতে চাও না। এটাকে প্রেম বলে না মোহন, একে বলে প্রবঞ্চনা। তোমার দৃষ্টিশক্তি আছে, তবে ক্ষীণ। তোমাদের মত এক শ্রেণীর লোক আছে, কুমারীকে মিষ্টি কথায় বের করে নিয়ে এসে সুযোগমত

দেয় ছুঁড়ে ফেলে অতল গর্ভে নির্ব্বিবাদে। তোমাদের বলি কাপুরুষ, ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, তোমরা শয়তান, পশু!

—সাবধান করে দিচ্ছি মাধবী, বড় ভাল হবে না। মুহূর্তে জ্বলে ওঠে মোহন।—বলছি ফল খারাপ হবে!

—তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছো, মোহন? জোরেই বলে মাধবী। আজ সে বেপরোয়া।

—কে ভয় দেখাচ্ছে—কিসের ভয়? একজন পাহারাদার এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো—কি হয়েছে আপনাদের?

মুহূর্তে তাদের মাধার টনক্ নড়ে গেল। চমকে উঠলো দু'জন। ভয়ে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু যে মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়েছিল, তার আবার কিসের ভয়! তার বুক যে পাষাণ হয়ে গেছে। সে সব করতে পারে।

মাধবী বললে—তোমাকে এখানে ডেকেছে কে? তুমি যাও তোমার কাজে। তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

মনে রাখবেন এটাও আমার কাজ! পাহারাদার বলে—পথে-ঘাটে আজকাল অনেক এরকম হয়, তাই আমরা পাহারা দিই। না দেখলে কত কাণ্ড ঘটে যেতো দিবালোকে।

—পাহারা দাও না হাতী করো! যত সব চোর-জোচ্চোর এসে জুটেছে। মাধবী গর্জ্জে ওঠে।

—দেখুন, যা তা বলবেন না! থানায় চলুন। আমার সন্দেহ হচ্ছে! আমার সাথে আসুন দু'জনে।

—যদি বাড়াবাড়ি করো, তাহলে তোমার ভাল হবে না বলছি। দূর্ হয়ে যাও এখান থেকে। মাধবী গর্জ্জে উঠে বলে।

পাহারাদার আর সহ্য করতে পারলো না।—আপনি কি আমাকে ছোটলোক ইতর ভেবেছেন! আজ এই পোষাকে আছি বলে আপনি আমাকে যা খুশী তাই বলে যেতে পারছেন। যদি আজ এ পোষাক ছেড়ে আপন পোষাকে আসতাম, তাহলে কখনই এমন কদর্য কটুক্তি করতে পারতেন না। আপনারা অপরকে

অশিক্ষিত, নিজেকে শিক্ষিত ভাবেন। আমরা চোরজোচ্চোর, কিন্তু আজ এই জগতে সাধু কে বল্‌তে পারেন? আপনারা সৎ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি, আর মাতব্বরি করো না, যাও! এক্ষুনি যদি তোমাকে দশ টাকার নোট্ এগিয়ে দেওয়া যায় তুমি হাত বাড়িয়ে নেবে।

—কিন্তু আপনাকে যদি একহাজার টাকা দেওয়া যায়, আপনি কি হাত বাড়িয়ে নেবেন না? মনে রাখবেন ছোটলোক করে চুরি, আর বড়লোক করে ডাকাতি—পুকুরচুরি। ব্যবধান এই। আপনাদের শাণিত দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হয়েছে নিম্নশ্রেণীর লোক। যারা রাতদিন চেয়ারে গা এলিয়ে থাকে, বের্ হয় গাড়ীতে, বসবাস করে পাঁচতলায়, তাদের কখনো গরীবের কথা মনে হয় না, তারা দেশের উপকারী নয়, অপকারী। তারা সমাজসেবী নয়, সেবা প্রার্থী। দেশমায়ের কুপুত্র তারা।

মাধবী হন্-হনিয়ে ছুটে যাচ্ছিল বাসে উঠবার জন্য। পাহারাদার বললে—কোথাও যাবেন না; আপনারা দু'জনে আমার নজরবন্দী।

ফিরে দাঁড়ালো মাধবী।—কি বললে? মানে, কিছু পয়সা চাও এইতো? কত চাও বলো?

—প্রয়োজন হলে অন্য কাউকে দেবেন, আমাকে নয়।

—কি সব বাজে কথা বল্‌ছো, মাধবী। এদিকে এসো। ধমক দিলে মোহন। ফিরে এলো মাধবী। বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌লো পাহারাদারের দিকে।

তারপর মোহন সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় দিলে। জানতে পেলো যে, মাধবীর বাবাকে সে ভালভাবেই চেনে! আর তাঁর সাথে আলাপও আছে। ভয় পেলো মাধবী। বেশী ভীত হলো মোহন। পাছে তার চাকরীর কোন ক্ষতি হয়। পাহারাদার অবস্থা বিবেচনা করে ছেড়ে দিলে সেদিন! নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো প্রেমিক-প্রেমিকা। নইলে অদৃষ্টে কত কেলেঙ্কারী ঘটতো কে জানে? মাধবীর ভেতর চাপা ক্রোধ তখনও বিদ্যমান।

*
* *

তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেল তাদের।

একদিন অফিসে এসেই মোহন রবীনকে ডেকে নিলে অন্তরালে। আজ সে ব্যক্ত করবে মনের কথাগুলো।

রবীন বললে—খামে আপনার একখানা চিঠি এসেছে, এই নিন্! পকেট থেকে চিঠিখানি বের করে দিলে সে।

পরম উৎসাহেই চিঠিখানা খুলে পড়লো মোহন। তারপর সেখানা ছিঁড়ে ফেলে দেয়! এটা তাদের সিদ্ধান্ত।

রবীন বলে—ছিঁড়ে ফেললেন কেন? প্রিয়ার চিঠি অতি যত্নে রেখে দেওয়া উচিৎ! তা নয় আপনি ছিঁড়ে ফেললেন।

মোহন বললে—পাগল হয়েছেন মশায়! রেখে দিয়ে শেষে বউয়ের কাছে ঝাঁটা খাই আর কি! অফিস থেকে যেতে একটু দেরী হলে এমনি বলে—এত দেরী কেন!

আপনার সাথে যে এঁর ভালবাসা আছে, তা আপনার স্ত্রী জানেন কি? রবীন প্রশ্ন করলো।

—হয়তো বুঝেছে! কারণ আগে মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় যেতো। মাকে কাপড় দিয়েছিল, বৌকে ইয়ারিং দিয়েছিল, আর আমাকে একদিন দিয়েছিল জামা কাপড়। গিন্নী জিজ্ঞাসা করেছিল—মেয়েটি কে? উত্তর দিয়েছিলাম—অফিসের যিনি বড়বাবু তাঁর বড় মেয়ে। খুব সহজ ও সরল স্বভাব। বাসায় গিয়ে আমাকে 'দাদা' বলেই ডাক্তো। তারপর যা তাই!

রবীন একটু হেসে বললে—সবার অসাক্ষাতে আপনাকে কি বলে ডাকেন? অবশ্য বলতে যদি আপত্তি না থাকে।

—তখন 'দাদা'র 'দ'ও থাকে না, সোজা 'তুমি'! যেন স্বামী আর স্ত্রী! সত্যিই বড় অদ্ভুত প্রেম। মনে পরে যখন ওদের অফিসে থাকতাম, তখন একদিন মাধবীর ছোট ভাই বিমল এলো আমার টেবিলের কাছে। চাইলো একখানা গল্পের বই। বললে—দিদি

চেয়েছে! সুতরাং সর্ব্বস্ব ডুবে যাক্ না, দিতেই হবে। দিলাম বই। তার ভেতরে ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে দিলাম—'ভয় করতে নেই।' বইখানা নিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার বুকের ভেভর হাতুড়ী পিটাচ্ছিল ভয়ে!

রবীন বললে—আপনি সোজা এইভাবে লিখে দিতে পারলেন! সাহস তো মন্দ নয়।

—আহা, তেমন ভরসা পেয়েছিলাম বলেই তো দিয়েছি। কারণ আমি যখন অফিসে আসতাম এবং অফিস থেকে যেতাম, তখন একঝলক চাইতাম দোতলার দিকে। দেখতাম চোখে মুখে তার হাসি ফুটে উঠতো? আমিও হাসতাম। এইভাবে প্রায়ই বই আদান-প্রদান হতো। ক্রমে-ক্রমে যৌন বই দিতে আরম্ভ করলাম। তার উত্তর পেলাম হাসির ভেতর। একদিন আমি অফিস থেকে চলে আসছি, এমন সময় আমার সামনে সিগারেটের একটি বাক্স পড়লো। আমি থমকে দাঁড়ালাম। চাইলাম চারিদিকে। দেখলাম—দোতলায় দাঁড়িয়ে আছেন—'তিনি'। অন্যদিকে চেয়ে আছে, অথচ হাস্‌ছে। তুলে নিলাম বাক্সটা পরম কৌতুকেই। তখনই খুললাম। পেলাম একখণ্ড চিঠি। ভয়ও হলো, আনন্দিতও হলাম। ফিরে চাইলাম, দেখলাম—তিনি নাই।

—আপনাদের মাঝে যখন এতখানি প্রেম, তখন তাঁকে বিয়ে করলেন না কেন? প্রশ্ন করে রবীন।

—অনেক বাধা ছিল। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মণ আর আমি কায়স্থ। দ্বিতীয়তঃ তাকে সুন্দরী বলা চলে না। তাছাড়া—

—এ্যাঁ! চম্‌কে ওঠে রবীন। আপনি বল্‌ছেন কি! তাহলে আমি বলবো—আপনি আজো তাঁকে ভালবাসতে পারেন নি! হয়তো চেষ্টা করেছেন। যেমন বেড়াল ইঁদুরকে ভালবেসে খেলা করে, তেমনি খেলেছেন। তিনি আপনার চাল্ বুঝতে পারেননি, তাই তিনি হাবু-ডুবু খাচ্চেন অকুল সমুদ্রে দেহ ভাসিয়ে দিয়ে।

শুনুন্ শুনুন্! কথাগুলো সব শুনুন আগে। আমি তার সেই

প্রথম চিঠি পেয়ে জবাব দিলাম বইয়ের ভেতর। বই নিয়ে গেল মাধবীর ছোট এক বোন। তাতে লিখেছিলাম—'আমাদের ভালবাসার পরিণতি যে পরিণয়ে দাঁড়াবে, এমন দুরাশা যেন না করো! প্রেম বিয়ের আশা করে, কিন্তু দাবী করতে পারে না।' উত্তর দিয়েছিল তার বোনের হাত দিয়েই—'আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছুই বলিনি তো!' এরপর তারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমাদের প্রথম মিলন ঘটলো 'ইডেন গার্ডেনে।' বলে থামলো মোহন।

রবীন নিজেকে সংযত করে নিলে। নইলে তার অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে। মোহনের তালে সামান্য কিছু তাল দিতেই হবে। তাই বললে—ও, তাহলে দোষ আপনার নয়। তিনি নিজেই স্বাগত জানিয়েছেন!

—নইলে আমি একটা অন্যায় করবো, বিশ্বাস করেন।

—না, অসম্ভব। আচ্ছা, আপনাদের এ ঘটনা কখনো কারো চোখে ধরা পড়েনি কি?

—নিশ্চয়ই পড়েছে। প্রেম কখনো লুকিয়ে করা যায় না। ধরা পড়তেই হবে। তার মায়ের কাছেই ধরা পড়লাম হাতে-হাতে। সেদিন আমার 'নাইট্ ডিউটি' ছিল। মাধবী আগেই আমার কাছে শুনেছিল বেড়াতে বেড়াতে। সেই সাথে কিছু পরামর্শও দিয়েছিল। আমি ভয়ে ও আশায় সে রাতে বসে ছিলাম অফিসে। কখন রাত তিনটে বাজবে! তিনটের ঘণ্টা পড়তেই অফিসের পিছনে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম জমাট অন্ধকারের কঠিন নীরবতা। ভয়ে গা শিউরে উঠছিল! একবার ভাবলাম ফিরে আসি; কিন্তু আশা আমায় বেঁধে ফেললো। ঠিক সেই মুহূর্তে নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরে সিঁড়ি বেয়ে নেবে এলো এক পরিচিতা। আমি যেতে অসম্মত হলাম, কিন্তু সে আমার হাত ধরে হিড়্-হিড়্ করে টেনে নিয়ে চললো উপরে। তারপর শুনবেন? হো-হো করে সহসা হেসে উঠলো মোহন। প্রায় কেঁপে উঠলো ঘরখানা তারপর স্তব্ধ।

রবীন স্তম্ভিত হলো। বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো মোহনের দিকে। তার কানে এমন ঘটনা যেন অভূতপূর্ব্ব।

—আমাকে তাদের 'বাথরুমে' ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চট করে দেখে এলো মা-বাবা এবং ভাই-বোন জেগে আছে কিনা। পর-মুহূর্তেই ফিরে এসে দরজায় ছিট্‌কানী লাগিয়ে দিলে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে এটা সেটা গল্প-গুজব হলো।

মুহূর্তে রবীনের শিরায়-শিরায় আগুন জ্বলে গেল। জ্বলে উঠ্‌লো বাঘের মত চোখ দুটি। অনেক চেষ্টায় সংযত করে নিজেকে!

—রাত তখন সাড়ে চারটে। আমি বের্ হবার জন্য বারংবার তাকে অনুরোধ করলাম। অবশেষে সে রাজী হলো। আমাকে সেখানে একটু অপেক্ষা করতে বল্‌লে। সেইসাথে জানিয়ে দিলে যে, যদি সে কারো আগমন বার্তা জানায় কাশির মাধ্যমে, তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন 'বাথরুম' সংলগ্ন খোলা জানলা দিয়ে বের্ হয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নেবে যায়। কিন্তু মিনিট তিনেক অপেক্ষা করেই সেই সুরঙ্গ পথে বের্ হয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নাবতেই পাশের বাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক চীৎকার করলো 'চোর চোর' বলে। প্রায় দশ হাত উঁচু থেকেই লাফ দিয়ে পড়লাম মাটিতে। আর যায় কোথায়! সেখানে ছিল ভাঙ্গা টিন। হাত-পা কেটে গেল। সেই অবস্থায় আমি পালিয়ে গেলাম!

—তারপর কি হলো? প্রশ্ন করে রবীন।

—তারপর সবাই জেগে উঠে হৈ চৈ করলো, ছুটোছুটি করলো। কিন্তু মাধবীর কোন সাড়া পেলাম না। সে হয়তো দূর্গানাম জপ করছিল।

রবীন মুখে হাত দিয়ে খুব হাসে। চমক্ লাগে প্রাণে।

মোহন বললে—আপনি হাসছেন যে! ভয় নেই, সেদিনের ঘটনা মারফৎ আমাদের খারাপ ভাবতে পারেন, কিন্তু খুব কলুষ চরিত্র ভাবা অন্যায় হবে। আমরা স্বর্গেও উঠিনি, মর্তেও নাবিনি, ঠিক মাঝ পথে বিচরণ করেছি।

—কিন্তু তাঁর মায়ের কাছে ধরা পড়লেন কোথায়.?

—ও! কোন্‌টা বল্‌তে কোন্‌টা বলেছি! যাক্‌ আগে এই ঘটনাই হজম করুন, তারপর সেটা বলা যাবে।

—আমরা সব কিছুই হজম করি বটে, কিন্তু কলম সে গুলো চিবোয়। সেখানেই আনন্দের পরিসমাপ্তি। আমরা লিখেই সব আশা-সাধ চরিতার্থ করি। কল্পলোকেই বিচরণ করি বাস্তবে কম।

—সে আর একদিন রাতের কথা—মোহন বলে যায়—রাত তিন্‌টের সময় সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ফিস্‌-ফাস্‌ করে কথা বলছি, এমনি সময় কোত্থেকে যেন তার মা এসে হাজির! বললেন—কে! চমকে উঠলাম দু'জনে। আমি ছুটে পালালাম সেদিন রাতে আমাদের যা অবস্থা, তা ভগবান জানেন। মাধবী মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। অনেক কাকুতি-মিনতি করলো—যাতে বাবার কানে কথাটা না তুলে দেন মা শুন্‌লেন না। মাধবী বলেছিল—মা ঐ ভদ্রলোককে ভালবাসি! তার যেন কোন ক্ষতি না হয়! তুমি আমায যে শাস্তি দেবে দাও, ওকে ক্ষমা করো। এমনি ধারা অনেক মিনতি করেছিল। কারণ তার বাবা ছিলেন একটি বাঘ।

—তিনি ক্ষমা করেছিলেন কি? প্রশ্ন করে রবীন।

—ক্ষমা করেছিলেন, তবে অনেকক্ষণ পরে। সেই সাথে মাধবীকে দিয়েস্বীকার করিযে নিয়েছেলেন যে, সে আর কখনো ছেলেটির সাথে মিশবে না কথা বলবে না। আপাততঃ মুখে সে রাজী হলো, কিন্তু তার মন গররাজীই থেকে গেল। অবশ্য তার বাবা জানতে পেরে-ছিলেন পরে। অফিসের অনেকেই জানতো। মাধবী চিঠি পাঠাত ছোট বোন্‌টার হাত দিয়ে। সে চিঠিখানি আমাকে একবার দেখিয়ে অফিসের 'লেটার বক্সে' ফেলে দিয়ে যেত, আমিও সাথে-সাথে যেয়ে নিয়ে আসতাম। এখনো দোতলা থেকে সুতো দিযে বেঁধে নামিয়ে দিত, আমি চট্‌ করে খুলে নিয়ে আমার চিঠি বেঁধে দিতাম। তার সাথে দেখা করবার প্রয়োজন হলে আমি জোরে কাসতাম, অমনি সে ছুটে আসতো। রাতে দেখা করবার প্রয়োজন হলে চৌবাচ্চার

কাছে যেয়ে বাল্‌তির তিনবার শব্দ করতাম। সে বুঝতে পারতো সঙ্কেতধ্বনি।

রবীন হাসলো। বললে—আপনাদের কলা-কৌশলগুলো অদ্ভুত! তাতে প্রাণ আছে, কথা নাই। ইঙ্গিত আছে, ক্লীবতা নাই। নতুনত্ব আছে।

মোহন কিছুক্ষণ ভেবে নিলে। তারপর বললে—দু'একখানি পত্র আমাদের অফিসের লোকের হাতে পড়েছিল। তারা ধরেছে, অথচ বলতে সাহস পায়নি। অবশেষে কে যেন শত্রুতা করে অরূপবাবুকে এক খানা পত্র দিয়েছিল বেনামীতে। সেদিন তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তারপর একদিন একটা তুচ্ছ কারণে আমায় তিরস্কার করলেন।

—আপনি প্রতিবাদ করলেন না কেন? অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেন মাথা তুলে সংগ্রাম করেন নি? কেন তার সেই অবিচারকে চরম প্রত্যাঘাত দিয়ে অফিসের গদী থেকে তাকে পথের ধূলায় নাবিয়ে দেন নি? এই নির্বিচারে মেনে নেওয়া শাস্তিকে আমি কাপুরুষতা বলে মনে করি।

—লাভের চেয়ে লোকসানের আশঙ্কা ছিল বেশী। চাকরী বিসর্জন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ন্যায়ের চেয়ে এখানে বুদ্ধি বড়। ফুটন্তর চেয়ে ঈষদুষ্ণর প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী, তাই ছিলাম নীরব।

—এটা গণজাগরণের যুগ। এ জাগরণকে এড়াতে পারবে না কেউ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারলেই বাঁচা; নইলে মৃত্যু। নিজের দাবী বা অভিযোগ পেষ করতে শিখুন; দলবদ্ধ হন তারজন্য। আপনি কালোচিত কাজ করেছেন বটে, ন্যায়োচিত মোটেই হয়নি। আপনাদের বিদ্যা ছিল, অথচ বুদ্ধি কম। চতুরতা ধৈর্যের বাঁধ লঙ্ঘন করেছিল। পরপারে যেয়ে দেখলেন খাঁটী সোনার খনি। পরম আশায় তুলে নিলেন, নিজের কাছে নিজে দোষী হলেন, কিন্তু উপভোগ করতে পারলেন না—এই দুঃখ!

সহসা হেসে উঠ্‌লো মোহন—বলছেন কি সব পাগলের মত! উপভোগ করিনি মানে যথেষ্ট করেছি!

গম্ভীর হলো রবীন বললে—খেয়ে যতখানি সুখ, তার বেশী সুখ খাইয়ে। ভোগের চেয়ে বেশী শান্তি ত্যাগে। ভালবাসাতে যে স্বস্তি বা আনন্দ, তার বেশী আনন্দিত হওয়া যায় ভালবাসা দানে। মানের চেয়ে দামী প্রাণ। রতনে রতন চেনে প্রবাদ আছে, কিন্তু প্রাণ কখনো সমকক্ষকে খুঁজে পায় না, মোহনবাবু।

—তবে তাই বলে ভাববেন না যে, আমরা পরিণামের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাদ পাইনি, তবে ঘ্রাণ পেয়েছি।

—ঘ্রাণ নিতে অনেকেই ফুলের কাছে যায়, কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারে ক'জনা বল্‌তে পারেন? অবশেষে ফুলের আর সেই শ্রী থাকে না, অথবা চোখে পড়ে তার অবলুপ্তি। সে পদদলিত হয়, কিন্তু কেউ তার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করা দূরে থাক, একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ছাড়ে না। সে যাদের জন্য প্রাণ দিলে, তারা ফিরে চাইলো না। এটা চিরাচরিত প্রথা।

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। মোহনবাবু বললে—আপনাকে একদিন তার সাথে দেখা করিয়ে দেবো। আমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে রেখেছে, আপনাকে দিতে চেয়েছে।

—সুসংবাদ! বেশ, গ্রহণ করবো।

*

* *

রাত অনেক হয়েছে, কিন্তু মোহনের চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুধুই ভাবছে। এদের পরিণাম কোথায়! পরিণামের কথা চিন্তা করতেই সে চমকে উঠে। ভীষণ ভয় পায়। কেঁপে ওঠে বুক, কেঁদে ফেরে প্রাণ।

আজ সে সাক্ষাৎ করেছে মাধবীর সাথে। মোহন তাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। মিলন ঘট্‌লো গড়ের মাঠে।

এর আগে মাধবী অনেক দিন মোহনের সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে

রবীনের সাথে ফোনে কথা বলেছে। অনেক রসময় অথচ নিষ্কলুষ কথার আদান-প্রদান হয়েছে। রবীন কখনো মোহনের সঙ্গ ত্যাগ করবার কথা তাকে জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু মন বাধা দিয়েছে। পাছে সে যদি ভুল বোঝে। যদি ভাবে যে, সে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছে তাদের এই আনন্দময় বন্ধন।

রবীন এটুকু বুঝতে পেরেছিল প্রথমেই যে, এর পরিণাম ভয়ানক। একজন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে মরীচিকার বুকে, অপরজন খেলা করেছে কলের পুতুলের মত। একজন দিয়েছে অপরের পায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন, অপর ব্যক্তি উপেক্ষার সাথে সেগুলি গ্রহণ করে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। কেউ বৈশাখী ঝড়, কেউ বা প্রচণ্ড হিম।

দিন পাঁচ-সাত আগে। মোহন রবীনকে সাথে করে নিয়ে গেল ধর্ম্মতলায়। পথে যেতে যেতে বললে—আজ মাধবী আমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এনে আপনার হাতে দেবে।

একথা শুনে রবীন প্রথমে বিস্মিত হলো। ময়লা জামা-কাপড়টা অন্ততঃ পাল্টিয়ে আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু যে জীবনে বাঁধনহারা, যে চিরউদাসী, তার আবার ভালো পোষাকে কী প্রয়োজন!

কিন্তু রবীন হয়তো জানে না যে, সে আধুনিক কালের লোক। পোষাক-পরিচ্ছদটাও অবশ্য প্রয়োজনীয়—সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় হতে হলে। দাঁড়ি-গোঁফ রাখা ও উদাসীনতা, পেয়েছে আজ অবলুপ্তি।

রবীন সেদিন দেখা করেছিল। সেই প্রথম দেখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে তাকে দেখতে পায়নি। এক মুহূর্ত মাত্র সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে নমস্কার বিনিময়, তারপরই রবীন সেই ইতিহাসের পাতা ক'খানি নিয়ে পালিয়ে গেল। সে দেখেছিল বৈকি! ব্যথায় শ্রদ্ধায় তার অন্তর ভরে গিয়েছিল। এত প্রেম যার বুকে, এত যে বিসর্জন করলো, বিনিময়ে সে পেলো কি? কিন্তু সে তো কিছুই পেতে চায়নি! সে শুধু সব কিছু অর্ঘ দিয়েই তৃপ্ত হতে চেয়েছিল। দেখ্‌তে চেয়েছিল শুধু গ্রাহকের মুখে পরিস্ফুট হয়ে থাক্‌বে সব

পেয়েছির হাসি। মাধবীর মুখে হয়তো দেখতে পাবে কত ব্যথার নিবিড় অন্ধকার। তাই চাইতে পারেনি রবীন।

মাধবী মোহনের অজ্ঞাতে রবীনকে ফোন করতো। পেতে চাইতো কিছু সান্ত্বনা, তার সাথে সহানুভূতি। রবীনও ব্যথিত হৃদয়ে অনেক বুঝিয়ে বল্‌তো। বলতো—আপনার এই প্রাণের দাম অনেক। আপনি একজনের চোখে তুচ্ছ হলেও সবার চোখে হেয় নন্‌। প্রাণের দাম জগতে সব চেয়ে বড়। অত বড় মূল্যবান আর কিছু নেই। প্রেম সে জায়গায় তুচ্ছ। এই প্রাণটুকু দ্বারা জগতে অনেক কাজ হবে। যাতে লাগাবেন, তাতেই ফল পাবেন, বিচারে হবেন আপনি জয়ী। প্রাণ যার থাকে, সেই জগৎ বরেণ্য, সেই মহৎ কর্ম্মের অধিকারী। এ প্রাণ অনেক উচ্চ স্তরের।

তাতে মাধবী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল,—আপনি এই দু'দিনে বুঝলেন, আর সে বুঝলো না। তবু আপনি হয়তো কিছুই শোনেননি, এক অংশও জানেননি। আজ পাঁচ বছর ধরে তপস্যা করছি, কিন্তু ফুল বুঝি চরণে পড়লো না আজও। আজও বুঝি তার ভাঙ্গলো না ঘুম।

রবীন বলেছিল,—তিনি বিয়ে করতে পারবেন না যখন জানালেন, তখন সরে গেলেন না কেন? তখন কেন সে জালে জড়িয়ে পড়তে গেলেন?

মাধবী বললে—কিন্তু তখন কি আর সরে যাবার উপায় রেখেছিল! আমায় পাগল করে ফেলেছিল!

উত্তর দিলে রবীন,—আপনি তাকে বিয়ে করলেন না কেন?

—আপনি কি বল্‌তে চান যে, লোক চক্ষুতে ঢাক-ঢোল বা বাঁশী বাজিয়ে, উলুধ্বনি সহযোগে সাত পাক ঘুরিয়ে এবং মালা পরিয়েই বিয়ে হয়? সবার অজ্ঞাতে কি আর বিয়ে হতে পারে না?

—এঁ্যা। চম্‌কে ওঠে রবীন।

—হ্যাঁ, শুনুন, ঠিক তাই! আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলতে চাই না। কিন্তু যারা সে সর্ত পালন করে না, সে কথা রক্ষা

করে চলে না, তাদের আপনি কি বলবেন? তাকে কি বলে ডাকবেন? মাধবী বললে।

—পশু, পিশাচ! গর্জে ওঠে রবীন।

—শুনুন, আরো শুনে রাখুন, আগে থেকে ধৈর্য হারাবেন না। আপনি যদি কখনো আমার সামনে আসেন, কখনো যদি আপনাকে কাছে পাই, সেদিন আমি দেখাবো তারই স্বহস্তে দেওয়া আমার সিঁথির সিঁদুর। আমি ঢেকে রাখি চুল দিয়ে! রবীনবাবু, এ দুঃখ —এ ব্যথা!—

—শয়তান—শয়তান! প্রবঞ্চক! পাষণ্ড! চীৎকার করে উঠলো রবীন। ঘড়াং করে রিসিভারটা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠলো।— এরা বিশ্বের শত্রু, এরা জগতের পাপ, এরা সব পারে! সর খেয়ে এরা দুধ ফেলে দেয়! এরা শুধু বসন্তের!

অফিসের অন্যান্য সবাই সেদিন হাঁ করে চেয়ে রইলো। কেউ ছুটে এলো। জিজ্ঞেস করলো ব্যাপারটা কী! উত্তর না পেয়ে চলে গেল।

সেদিন রবীনের যে অবস্থা ছিল, আজ তা চরমে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বকর্ণে সে যা শুনে এসেছে, তা সে মোটেই ভুলতে পারছে না।

গড়ের মাঠে আজ তিন জন ঠিক সামনা সামনি বসে ছিল। মাধবী দশটায় ফোন করেছিল। সে বলেছিল—রবীনবাবু, আজ আপনার সাথে আমার মিলন ঘটবে! সাবধান! সামনে থেকে যদি কেউ কথা বলতে না পারি, তবে এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু থাকবে না! আমি যদি না বলতে পারি, আপনি ভরসা দেবেন, আর আপনি না বলতে পারলে আমি দেবো। হুঁসিয়ার।

রবীন উত্তর দিয়েছিল—আপনিও হুঁসিয়ার থাকবেন।

মাঠে বসে মোহন মাধবীর কাছে তার অন্যান্য বন্ধুদের কথা বলছিল। তার এক বন্ধু প্রণয়িনীকে কি বলে যেন খুব গালাগালি করেছে। মেয়েটি কেঁদে তার পা জড়িয়ে ধরেছিল। আর এক বন্ধুর অবস্থা নাকি তারই মত। মেয়েটি কায়স্থ, ছেলে ব্রাহ্মণ। মেয়েটি

এখন তাকে বিয়ে করতে বল্‌ছে। কিন্তু ছেলেটি মা-বাবার ভয়ে রাজী হচ্ছে না।

রবীন সে কথায় উত্তর দিয়েছিল—তাহলে আমি বলবো যে, আপনার বন্ধুটি তাকে ভালবাসেনি। যাকে প্রাণের মত ভালবাসা যায়, তাকে বিয়ে করতে বাধা কিসের বুঝি না।

—মেয়েটি যে কায়স্থ। মোহন বলেছিল।

মুহূর্তে রবীনের মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললে—যান্‌, ওসব বাজে কথা আমাকে বলবেন না। ।প্রেম কখনো জাতিধর্ম্ম বিচার করে না, মোহনবাবু। প্রেম দেখে না হিন্দু-মুসলমান, মানে না চীন-খৃষ্টান। প্রেম চায় না অর্থ, সে আশা করে প্রাণ। প্রেম করবার সময় মনে থাকে না!'

মোহন একটু জ্বলে ওঠে।—প্রেম সম্বন্ধে আপনার কোন আইডিয়া নাই। ভাল বাসলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে, এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিনে।

—তা হয়তো নেই, কিন্তু একথাও ঠিক যে যাকে ভালবাসা যায় তাকে দূরে রাখা যায় না।

—ভুল। দূর থেকেই ভালবাসা ভাল, তাতে আনন্দ।

—কিন্তু এই কথাটুকু প্রথমে মনে রাখাই সঙ্গত ছিল, তাহলে আপনাদের উভয়েরই মঙ্গল হতো। আপনি নারীকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন কেন? কেন পুরুষকে অতখানি আপন করে নিতে পারেন না? মনে রাখবেন, ভালবাসার মূলটি বিরাট স্বার্থে পরিব্যাপ্ত।

স্বার্থ! ভুল করলেন রবীনবাবু। বলে মোহন।

—না, এতটুকু ভুল করিনি। আমি বলি, শুনুন, পুরুষ নারীকে যতখানি ভালবাসে, নারীও পুরুষকে ততখানি ভালবাসে। যেমন ছেলেকে মা ভালবাসেন বেশী, আর বাবা বাসেন মেয়েকে। এটা আমাদের রক্তের প্রতি অণুতে লেখা আছে। এড়াবার উপায় নাই, মনের কথা। আজ একটি কথা মনে পড়ছে। সেদিন এক ভদ্রলোক তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তার বৌদি কেমন

আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা প্রায়ই লক্ষ্য করি অনেক জায়গায়। আপনি আপনার কোন পরিচিতের বাড়ীতে গেলে সেই বাড়ীর মেয়ে বা বৌদের সাথে কথা বলতে না পারলে হয়তো আপনার শান্তি আসবে না। আপনি যে প্রেমের কথা বল্‌ছেন, সেটা অন্যস্তরের, আপনার নয়।

মাধবী এতক্ষণ চুপ-চাপ শুনছিল। এবার সে বের্ করলো একটি ঠোঙ্গা। কলেজ থেকে ফেরবার পথে একটি দোকান থেকে কতক-গুলি ডিমের চপ্ কিনে এনেছে। মোহনকে খাওয়াবে সে, মেয়েদের প্রেমের লক্ষণ যা হয়ে থাকে।

হাসলো রবীন। তার পরমুহূর্তেই গম্ভীর হলো।

মাধবী দেখলো। মোহন বললে—হাসছেন কেন?

রবীন উত্তর দিলে—ইনি এনেছেন কত দূর থেকে চপ্ আপনাকে খাওয়াবেন বলে। কিন্তু আপনি কোন দিন এমনি ধারা এনেছেন কি?

নিঃশব্দে হাসলো মাধবী। বললে—আমার সেই সৌভাগ্য হবে! সেদিন সূর্য উঠ্‌বে পশ্চিম থেকে। থাক্, আমি খেতে চাইনে বাবাঃ।

মাধবী ঠোঙাটি মোহনের হাতে তুলে দিলে। মোহন পরিবেশন করলো। তিনজনেই পরম আনন্দে খেলো।

কিছুক্ষণ পরে মাধবী বল্‌লে মোহনকে একটী সিনেমা দেখাতে। মোহন জানালো যে, তার পয়সা নাই! অবশেষে মাধবী নিজেই দেখাবে বলে স্বীকৃত হলো।

রবীনের মন বলে উঠ্‌লো—এরা সর্ব্বস্ব দিয়ে চায় প্রেম, চায় না অর্থ। অর্থ থাকলেই প্রেম হয় না।

অনেকক্ষণ যাবৎ রবীনকে নীরব থাক্‌তে দেখে ওরা অবাক্ হলো। মোহন বললে—কি ভাবছেন ওদিকে চেয়ে?

—এঁ্যা! ও, না, কিছুই না! ভালকথা, আপনার সেই বন্ধুটির সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পরেন?

—দেখ্‌বো চেষ্টা করে! মোহন বললে—কেন, তাকে কি শাস্তি দেবেন?

—যোগ্যতা নেই।

দূরে গঙ্গার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রঞ্জিত হয়ে উঠেছে সারা পশ্চিম আকাশখানি। কখনো ভেসে আসে জাহাজের বাঁশীর ঘন-ঘন শব্দ। অফিস ফেরৎ বাবুদের ভিড় দেখা যায় সর্ব্বত্র। কেউ যায় হেঁটে, কেউ ট্রামে-বাসে, কেউবা আপন গাড়ীতে।

রবীন ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে। পালাতে পারলে বাঁচে। অবশেষে এক সময় সে বলে উঠ্‌লো—এবার চলি!

তারা স্তম্ভিত হলো। সহসা কিছু বল্‌তে পারলো না মাধবী মাথা নীচু করে রইলো।

মোহনও উঠে দাঁড়ালো। রবীনের অনুগামী হলো উভয়েই।

রাত একটা বাজে। রবীনের চোখে এতটুকু ঘুম নেই। আজ তার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎতের ঘন শিহরণ খেলে যাচ্ছে। রক্তের অণুতে অণুতে আগুন জ্বলছে। ভাবে—বিয়ের আগে মাধবী ছিল মোহনের অতি আপনার। তখন রাতদিন তার পেছনে মাতামাতিই ছিল কাজ। অর্থ তখন তুচ্ছ ছিল। একদিন সে মাধবীকে জিজ্ঞেস করবেই যে, সে কেন এই অল্প বেতনভোগী লোককে ভালবাসতে গিয়েছিল! কিন্তু পরমুহূর্তে মনই উত্তর দেয়—প্রেম কখনো ধনী নির্ধন দেখে না। মনে দাগ লাগলেই যথেষ্ট!

হঠাৎ একটা কথা রবীনের মনে পড়ে যায় এই সময়। তাদের অফিসে এক ভদ্রলোক আছেন। শ' পাঁচেক টাকা মাইনা পান। বয়স প্রায় চল্লিশ। সম্প্রতি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেছেন। বৌটি বেশ সুন্দরী। অল্প বয়স্কা। সেদিন অফিসের এক ভদ্রলোক বিশেষ কার্য্য বশতঃ গিয়েছিল তাঁর বাসায় দেখা করতে। দরজায় কড়া নাড়তেই তিনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে এসে লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে টান্‌তে-টানতে নিয়ে গেলেন পঞ্চাশ গজ দূরে একটা

বাড়ীর আড়ালে। বললেন—বলো—বলো, এখন বুঝ না।
কি ব্যাপার! হুন,

ভদ্রলোকটির এমন অদ্ভুত সৌজন্যে হচকচিয়ে গিয়েছিল প্রথমে পরে বুঝতে পেরে প্রাণভরে হেসেছিল, আর সবাইকে বলেছিল ইতিহাসটা। সেই সাথে গুপ্ত রহস্যও ফাঁক করে দিয়েছিল যে, ভদ্রলোকটি যা মাইনা পান, সবই তাঁর বৌয়ের হাতে ধরে দেন। অফিসে যাবার সময় দুটো পয়সা চাইতেন টিফিন করবার জন্য। কখনো পেতেন, কখনো নিরাশ হতেন! তিনি টাকা দিয়ে ভুলাতে চেষ্টা করতেন কচি বৌয়ের মন। কারণ, যৌবন তাঁর স্তিমিতপ্রায়। অন্য কোন উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। তা ছাড়া মেয়েছেলে লক্ষ্মীর জাত! অর্থতেই সন্তুষ্ট আপাততঃ! এই তাঁর ধারণা ছিল।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে, মানুষের অধিকার বা প্রাপ্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে খাঁচায় বন্দী রেখে দৃষ্টি ভোগের তুষ্টি সাধন যেমন ঘৃণ্য, তেমনি অন্যায় অবিচার।

রবীন এদের বরদাস্ত করতে পারে না। এরা নিজেরা বদ, তাই সবাইকে বদ ভাবে, সবাইকে অসৎ প্রতিপন্ন করে।

*

* *

মাধবীর সাথে রবীনের সাক্ষাৎ হবার কিছু আগের কথা। মোহনকে রবীন বলেছিল,—এখনও কি বাল্তি শব্দ করলে বা তেমনি ধরা কাস্‌লে বের্ হয়ে আসেন মাধবী?

—অবশ্যই! যদি সে ঘরে থাকে, বা কানে শব্দ যায়।

তাই একদিন বিকালবেলা রবীনকে সাথে করে নিয়ে গেল মোহন সেই অফিসের দিকে। দেখিয়ে দিতে চায় তাদের সঙ্কেতটা।

অফিসে ঢুক্‌তেই জোরে কাস্‌লো মোহন। দোতলার রেলিংয়ের দিকে চেয়ে রইলো রবীন। ঠিক দু'এক মিনিট পরেই বেড়িয়ে এলো মোহনের মানসী। দেখলো রবীন। হাসলো খুব। মোহন হাসে। তাদের হাসি দেখে মাধবীও হেসেছিল।

্ন বলে,—এই অফিসে বসে কত কি খেয়েছি! কখনো সেবার অলক্ষ্যে টিনের কৌটায় এনেছে মাংস, কখনো লুচি-মিষ্টি, এরে কখনো অন্যান্য খাবার। কেউ জানতে পারেনি।

—তাঁর মনে কত আশা-সাধ ছিল, কিন্তু তার কতটুকুই বা আপনি পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন! তিনি বর্ষার দু'কূল প্লাবিত শ্রাবণের বেগবতী ধারার মাঝে তীরবর্তী গাছের আল্‌গা শিকড়টির সাথে নৌকোর দড়ি বেঁধেছিলেন, সে শিকড়টা যে বন্ধন মুক্ত হলো নৌকাটাকে প্রখর স্রোতের মুখে ভাসিয়ে, একথাটি কি অসত্য?

মোহন গম্ভীর হয়ে গেল। একপায় দু'পায় পথ বেয়ে চললো। উত্তরের অপেক্ষায় পিছু পিছু চলে রবীন।

—অসত্য যে একথা আমি অস্বীকার করবো না। মোহন উত্তর দিলে।

রবীন বল্‌লে—তাঁকে বুঝিয়ে ত্যাগ করাতে চেষ্টা করালেন না কেন আপনার সংস্পর্শ? কেন তাকে বিয়ে করতে বলেন নি?

—সে আর জীবনে বিয়ে করবে না। সে বলে তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার মা-বাবা অনেক ধনী ও বিদ্বান ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সে তার মাকে না জানিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে।

—ভেবে দেখুন, কত ব্যথা নিয়ে তিনি কালাতিপাত করছেন। নিশ্চয়ই আপনাকে স্বামী ভেবে পূজা করে চলেছেন সব কিছু তুচ্ছ করে।

—তা যদি ভেবে থাকে, তাহলে কি সে অন্যায় করেনি মনে করেন, রবীনবাবু! আমি তো বলে দিয়েছি যে, আমার দ্বারা কোন আশাই তোমার পূর্ণ হবে না। কিন্তু সে বলে—তুমি ভুলে যাও, আমি তোমায় ভুলবো না, তুমিই আমার সব, তোমার চরণে আমি নিবেদিতা। এই জন্যই আজকাল তাকে এড়াতে চেষ্টা করছি। যাতে সে বিয়ে করে।

—অত সোজা নয়, মোহনবাবু। প্রেম গড়া যত সোজা, ত্যাগ

করা তত সোজা নয়। ত্যাগ করার মত শক্তি সবার থাকে না। আপনারও নাই। আপনি তাঁকে যতখানি না ভাল বেসেছেন, তার চেয়ে বেশী বড় করে চেয়েছেন, ও বুকে স্থান দিয়েছেন তিনি আপনাকে। সত্যিই মাধবী নমস্য। প্রেম জানেন তিনিই, আর আপনি অবসর বিনোদন করেছেন। যেমন চাটনীর প্রয়োজন হয় আমাদের।

—তাহলে আপনি কি বল্‌তে চান্‌ যে, আমি ভালবাসি না ?

—মোহনবাবু, সত্যিই তাই মনে হয়। হয়তো ভালবাসেন, কিন্তু তাতে গভীরতা নেই, সেই তুলনায় তিনি অতল সমুদ্র। তাঁর প্রাণ বড় এবং দামী, আপনি তার মূল্য দিতে পারেননি। এভাবে ছাড়তে গেলে একদিন শুনতে পাবেন মাধবী আত্মহত্যা করেছেন মনের দুঃখে। তখন আপনার এই কঠিন প্রাণ কি বারেকের জন্যও কেঁদে উঠবে না! কাঁদবে, অবশ্যই কাঁদবে, সেদিন সান্ত্বনার ঠাঁই পাবেন না। বৌ সেদিন বুঝবেন না, বুঝলেও সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। আমার চোখে যেন রাতদিন সেই ভয়ঙ্কর ছবিটিই জেগে ওঠে। তখন বুক কেঁপে কেঁদে ওঠে। আপনার জন্য নয়, মাধবীর জন্য।

মোহন কিছুক্ষণ ভেবে পরে বললে—আমি সত্যই আপনাকে বিশ্বাস করি। তাই আমি আপনার কাছে চাই উপদেশ। এখন আমার কি কর্তব্য ?

—আর একদিন বল্‌বো, আজ নয়! কিন্তু আমার কথা কি শুনবেন আপনি ?

—নিশ্চয়ই শুন্‌বো!

রবীন বলে,—আপনারা দুজনেই আমার কাছে সমান! তবে এটাও ঠিক যে, আপনার মত তিনি ভেসে বেড়ান না। তাঁর প্রাণ আছে, আছে প্রেম। আপনারা দুজনেই সহজ ও সরল। কিন্তু মাত্রাধিক্য দেখা যায় মাধবীর বেলায়।

—কেন আমার দোষটা কোথায় ?

—আছে, মোহনবাবু, আছে। আপনি তাকে আজকাল কোন

আমলই দিতে চান্না, কোথাও দেখা করতে বললে দেখা করেন না। তাকে আপনি রীতিমত ঘৃণার চক্ষে দেখেন?

—আপনি নির্ভুল বিচার করছেন না রবীনবাবু। আমি জানি সে আমায় কখনো ভুলতে পারবে না। অথচ আমার এখন এই একমাত্র কাজ নয় কি, যাতে সে আমাকে ভুলে যেতে পারে!

—না, সে ওভাবে নয়। আর একটা কথা বলি, আপনারা এখনও আমায় বিশ্বাস করতে পারেননি। অনেক কিছু গোপন করে চলছেন। রবীন ঘা দিয়ে কথা আদায় করতে চেষ্টা করে।

—না-না, আপনার ধারণা অমূলক।

রবীন বলে—মানুষ বড় স্বার্থবাদী, মোহনবাবু। কেউ হয়তো কম, কেউ বেশী। অস্বীকার করবার উপায় নেই, তবু একথাও সর্বত্র অপ্রযোজ্য। আমার বেশ মনে পড়ে, আমার এক বন্ধু আমাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল তার কাকার বাসায়। তিনি আমাদের দেখেই চমকে উঠলেন। প্রথমেই আপ্যায়ণ করলেন—বলি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এলে?' বন্ধু বললে—এমনি দেখা করতে এলাম! তিনি অস্বীকার করলেন—অসম্ভব! একটা কারণ না নিয়ে কেউ কোথাও যায় না। তোমার স্বার্থটা কোথায় তাই বলো। আমরা দু'জনেই হতভম্ব হলাম। বলেন কি! বিনা কারণে আসাও কি অনুচিত! দেখা করার কথা তিনি মানতেই চাননা। এই এক ধরণের লোক। অথচ তিনি উচ্চ শিক্ষিত।

—তারপর কি হলো?

—আমরা চলে আসছি, তিনি বলে উঠলেন—কিছুই বললে না যে! উত্তর না দিয়েই চলে এলাম। আসতে আসতে বন্ধুও কথা বলতে পারে না, আমিও পারি না লজ্জায় ও দুঃখে। এই একপ্রকার স্বার্থপরায়ণ মানুষ দেখলাম।

সেদিন বৃহস্পতিবার। রবীন অফিসে এসে বসে ভাবছে মোহনের কথা। সত্যিই বেচারা ভাল লোক, আর বেশ সরল। সবার সাথেই তার মধুর আলাপ। নিম্নপদস্থ উচ্চপদস্থ সবাই তার কাছে যেন

আপনার। ছোটকে সে কখনো ছোট চোখে দেখে না! সবাই যে মানুষ—এই কথাটা সে বড় করে জানে। হয়তো মাধবীও তাই, তবে পরিমাণে কিছুটা কম। পরিবেশ মানুষকে গড়ে তোলে। অসৎসঙ্গে মিশলেও সবাই অসৎ হয় না। তিলে তিলে কারো মনে জমে তীব্র অনল রাশি, করে বিদ্রোহ।

টেবিলের উপর টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রবীন 'রিসিভার' তুলে বললে—হ্যালো!

—হ্যালো! মধুর নারীকণ্ঠ ভেসে উঠলো।—কে বলছেন আপনি?

—আমি রবীন বলছি! নমস্কার!

—নমস্কার! ভাল আছেন তো?

নিশ্চয়ই! আপনি? রবীন প্রশ্ন করে।

—বিশেষ ভাল নয়! মোহন কোথায়?

—এখনও আসেন নি, আসতে দেরী হবে—বলেছেন। কেন, কিছু বলতে হবে কি?

—শুনুন, আমার সাথে কাল রাগারাগি করে চলে এসেছে। দেখুন, জীবনে তো কিছুই পেলুম না, চেয়েছিলাম শুধু তার সঙ্গসুখ। সেটুকু থেকেও আমায় দিনে-দিনে বঞ্চিত করছে। কাল সন্ধ্যা বেলায় কার্জ্জন পার্কে বসে গল্প করছি, পনেরো মিনিট না হতেই বলে—আমি চললাম, দেরী করতে পারবো না, অনেক কাজ আছে। আমি বারবার অনুরোধ করলাম আর একটু থাকতে, সে রেগে চটে লাল। শেষে আমায় গালাগালি করে চলে গেল!

—কেন, কি কাজ ছিল?

—জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বললে না। অথচ আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সাথে কাটিয়েছে। আমার বাড়ীতে ফিরবার তাড়া থাকলেও ছাড়েনি। আমিও তার আশা পূর্ণ করে চলেছিলাম। কিন্তু আজ ও নিজের কাজটাকে বড় করে দেখলো, আমার কথা হলো তুচ্ছ! আমি কিসের আশায় বেঁচে থাকবো বল্‌তে পারেন,

রবীনবাবু। আমার দুঃখ একমাত্র আপনিই বুঝবেন জানি। আপনার প্রাণ আছে মহৎ আপনি।

রবীনের প্রাণ কেঁদে ওঠে। দুঃখ প্রকাশ করে। নারীর অশ্রু বা ব্যথা সে সহ্য করতে পারে না। কেঁদে ওঠে তার প্রাণ। দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। এটা তার দোষ কি গুণ বুঝতে পারে না। হয়তো এটা তার দুর্ব্বলতা।

মাধবী বললে—আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, তাই যত মনের কথা আপনাকে বলি এবং আরো বলবো। আমার অনুরোধ আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন, যাতে সে আমার সাথে একটু বেড়ায়। নইলে আমার মোটেই ভাল লাগে না, শুধু চেয়েছি তার সাহচর্য, এটুকুও সে দিতে পারবে না! আর আমি যে বললাম একথা জানাবেন না, কৌশলে বলবেন।

—হ্যাঁ, ভাল কথা, সেদিন আপনি যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু দিলেন আমার হাতে, সেটা আমি পড়েছি। অনেক কিছু জানতে পারলাম। আপনি আমার নমস্য। মানুষকে বিচার করি তার প্রাণ দেখে। সত্যিই আপনি প্রেমিকা। অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা-জ্বালা সহ্য করেছেন। আপনার মঙ্গল হোক, ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা। একটা কথা, কখনো আপনি নিজেকে ছোট ভাব্‌বেন না। আপনার দ্বারা জগতের অনেক উপকার হতে পারে।

মাধবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে বললে—আপনি যে একখানি গল্প লিখতে চেয়েছিলেন আমাদের সম্বন্ধে, লিখবেন তো?

—নিশ্চয়ই লিখবো। আমি দেখতে চাই আপনার মঙ্গল শুন্‌তে চাই আপনার সুনাম। যাদের বুকে প্রেম আছে, তারাই প্রেমের মূল্য দিতে জানে। প্রেম দিয়েই জয় করা যায় মানুষকে, বিশ্বকে। ভয় দেখিয়ে জয় করা অসম্ভব। আর সেটা ক্ষণস্থায়ী। পুনরায় অঙ্কুরিত হতে পারে পুরানো বীজ ভয়, দেখিয়ে সম্মান আদায় করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না।

মাধবী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো বুঝা গেল। বললে—আমি তো প্রেম দিয়ে জয় করতে পারলাম না, তাকে।

—ভুল বলছেন! তাঁকে জয় করেছেন! যেদিন থেকে তাঁকে বাস্তবিক পক্ষে ভালবেসেছেন, সেই দিন থেকে তাঁর অন্তরেও একটা ছাপ পড়েছে আপনার প্রতিকৃতির। তা সে যত কঠিন প্রাণই হোক্ না কেন, কেউ অন্তরে ভুলতে পারে না। এরা জানে সব, পেতে চায় আরো বেশী, বোঝে সব, জানতে দেয় না; পাছে দৌর্বল্য প্রকাশ পায়। মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না, পড়ে গেলে 'হায়-হায়' করে! এটাই এদের সভাব। এরা প্রেম করে ওজন রেখে, কথা বলে পরিমাণ মত। এদের উদ্যম আছে, উন্মাদনা নেই। সব কিছু পরিপূর্ণ করে পেতে চায়, দিতে চায় না এক রত্তি।

—রবীনবাবু, বলতে পারেন এখন আমি কি করবো! এই অবহেলা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। হয়তো আমার সাথে সত্যিই দেখা করবে না। আমি একখানা চিঠি দিয়েছি ওকে, আপনাদের অফিসের ঠিকানায়। দেখবেন পেলো কিনা। কি বলে শুন্‌বেন। কালকে আপনাকে ফোন্ করে জেনে নেবো!

—আচ্ছা, শুনে রাখবো।

নমস্কার বিনিময়ে সেদিনকার কথা শেষ হলো। রবীন ভাবে, শুধুই ভাবে! কি করা যায়। একটা সরলা অবলা নারীকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে একটা কাপুরুষ! কেন? এরা কি তাহলে মৌমাছি! ফুল থেকে মধু নিয়েই দেয় চম্পট। কিন্তু একবারও ভাবে না কি—এর ভবিষ্যৎ কোথায়! মৌমাছি যে মন্থন করলো ফুলের কোমল সরস বুকখানা, তার স্পর্শে কী যে অঙ্কুরিত হলো, এটা কি লক্ষ্য করে না! কেন এত স্বার্থপর?

রবীন এই দীর্ঘস্থায়ী অম্লমধুর প্রেমের কাহিনী অনেক বন্ধুদের কাছে জানালো। কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ বলে—যত সহজ ভাবেন, ততটা নয়! অম্লমধুর বল্‌লে ভুল হবে, তার চেয়ে রসঘন বলুন। একাদশী করে ডুব দিয়ে জল খেলে আপনি বুঝবেন কি করে! মান্‌তে

চায় না রবীন। দারুন প্রতিবাদ করে। বচসার সৃষ্টি হয়। কেউ বলে—হু। নির্ঘাৎ ফল্স!

এক বন্ধু বললে—শুনুন মহাশয়, আজকাল প্রেম মানেই লোভ। লোভ যদি না থাকবে, তবে শিশু বা বৃদ্ধের সাথে প্রেম করে না কেন?

—প্রত্যেকেই চাই সমপর্যায়ভুক্তকে। শিশু চায় শিশুকে, যুবক চায় যুবতীকে, বৃদ্ধ চায় বৃদ্ধাকে।

—বেশ, তাই যদি হবে, তবে, শিশুদের সাথে আবেগে কখনো হেসে ওঠেন, কখনো কাঁদেন কেন? সেখানে আপনাকে এত আনন্দিত হতে দেখি কেন?

রবীন হাসলো। বলে—আমার কথা বাদ দিন! আমি কি একটা মানুষ? আমার আবার প্রসঙ্গ!

—না-না, ওসব শুন্‌বো না, উত্তর দিতে হবে। বন্ধুরা চীৎকার করে ওঠে।

রবীন বলে—আমি সত্যিকারের সহজ কিনা জানি না। তবে আমারই মত সহজদের খুঁজে ফিরি। ওদের ভাল বাসলে, ওরা মূল্য দেয়! ওরা বোঝে, ওজন করতে যায় না কিছুই। তাই আমি শান্তি পাই, আনন্দ পাই—ওদের সাথে মিশে। ওরা যে শিশু, পবিত্র প্রাণ। ওদের মাঝে উৎসর্গ করি আমার অনাবিল প্রেমরাশি। মনে পড়ে একদিনের কথা। একটি পাঁচ বছরের শিশুর সাথে প্রাণ খুলে কথা বলে যাচ্ছি শিশু হয়ে। সেও বলছিল তার যত মনের কথা, আমিও শুনছিলাম, আর বলছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম বিশ্বজগৎ। মনে হয়েছে—সে বলছিল—আমি বড় হয়ে তোমার মত হবো। আমি বললাম—কেন রে, আমার মত হতে যাবি কেন! আমরা বড় ভাগ্যহীন, কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না। আমাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট করতে হয় জীবনে। তবু সে বারবার বলে—না, আমি তোমার মতই হবো। আমি খুব জোরে হেসে উঠেছিলাম। ঠিক তার পরমুহূর্তেই তার মা এসে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল ছেলেটিকে। আমি চম্‌কে উঠলাম। দেখলাম সব। ব্যথায় বুক-ফেটে গেল।

দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর প্লাবন। রাগ হলো তার মায়ের উপর। চলে এলাম তখনি।

হয়তো রবীনের কথা সত্যি। গর্ব এবং প্রচার নাও হতে পারে। কিন্তু যদি বাইরের কোন লোক থাকতো সেখানে, তাহলে বলতো—বাড়াবাড়ি। ওরা জানে বলেই মেনে নিলে সহজে রবীনের কথাগুলো।

বন্ধুরা বলে,—তাহলে বিচার করুন!

—না, তবু বিচার করা যায় না। প্রেম আছে তাই সবাইকে ভালবাসি। কিন্তু পুরুষ কখনো নারীকে ছাড়তে পারে না, নারী কখনো পুরুষকে এড়াতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার বিধান মানতেই হবে। কারণ, শিশুকাল থেকে মায়ের সাথে থাকে সকল সম্পর্ক, তারই কোল থেকে বেড়ে উঠেছি, তার স্নেহে, আদর-যত্নে; তাই নারী জীবনের মাঝে অপরিত্যাজ্য।

—কেন, রামকৃষ্ণ কি এড়াতে পারেন নি?

—না, তিনিও পাশে নারীকে বসিয়ে সাধনা করেছেন। তার কাছে নারীর প্রয়োজন ছিল শক্তির জন্য, সৃষ্টি বা স্পর্শ সুখের জন্য নয়। সে নারী তার কাছে এসেছিলেন সহজ-স্বাভাবিক নারীত্ব নিয়ে। কিন্তু পাশে স্থান পেলেন সহায়িকা, মন্ত্র সাধিকা দেবী রূপে। স্পর্শমণির পরশে পাথর হলো মাণিক। যতদিন সংসারে আছি, ততদিন নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না!

বন্ধুদের ভেতর একজন বললে—তাহলে আপনারা প্রেম করেন যত্র-তত্র?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বলে—আমার কথা বলে গর্ব করার পরিবর্তে বলতে চাই যে, কতক মানুষ আছে, যাদের প্রেম সার্বজনীন হয়ে ওঠে। সবাইকে ভাল বাসে। কীট-পতঙ্গ, ফুল-ফল এবং তরুলতা থেকে আরম্ভ করে নর-নারী পর্যন্ত।

—সবাইকেই একই রকম ভাল বাসেন? তাতে কি কাম নেই?

—প্রায়। কেউ অন্তর স্পর্শ করতে পারে, কেউ পারে না,

জলের বুকে তেলের মত ভেসে বেড়ায়। কাম অনেক রকম ভাবে চরিতার্থ হয়। মিলে মিশে, কথা-বার্তায়, নেচে-গেয়ে, কল্পনায়, আলাপ-আলোচনায়।

—তাহলে আপনাদের মনেও জঞ্জাল থাকে ?

—না সেখানে প্রেম শুধু প্রেমই, সেটা অব্যক্ত থাকে। সেখানে স্পর্শ সুখের কথা আসে না, কাম চরিতার্থ করবার প্রয়াস থাকে না। থাকে শুধু নিষ্কাম মিলন। দেখেই সুখ সেখানে, অসৎ কর্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই মিলনই স্বর্গীয়, পরম আনন্দের। এর চেয়ে বড় আনন্দ বিশ্বে বুঝি আর কিছুতেই নেই। ঐ যে আপনি কামের কথা বললেন। কাম মানুষের প্রাণে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে আদর্শটাই সব চেয়ে বড়, সেখানে মনটা সর্বদাই সজাগ থাকে। ন্যায় অন্যায়ের কথা সেই বলে দেয় কানে-কানে; ধরে লাগাম। তবে এটাও ঠিক, কোন পুরুষ বা নারী মনে-প্রাণে পাপী নয় কি ?

—কি করে ?

—কোন কুমারী বা বধূ যদি দেখতে পান্ একটি রূপবান এবং গুণবান ছেলেকে, কিম্বা কোন পুরুষ যদি দেখতে পান কোন রূপবতী গুণবতীকে, তাহলে তাঁদের মন কি একবারও বলে না—ওকে বিয়ে করতে পারলে জীবনটা ধন্য হতো। আমি চ্যালেঞ্জ করছি কেউ যদি বলেন—না, আমি ভাবি না, আমার নিজেরটাকেই বড় করে দেখি, তাহলে আমি তাঁর চরণে প্রণাম জানাবো।

—আমি, আমি তাদের ভেতর একজন! ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বন্ধুর বৌ।

সবাই হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইলো। এ বলে কি! করযোড়ে রবীন বললে—তাহলে আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন!

আপনি ও আমার প্রণাম গ্রহণ করুণ! তেমনি হেসে বিদায় নিলেন বধূটি।

সভা নিস্তব্ধ নিষ্প্রভ হয়ে এলো। কারো মুখে কথা নেই। রবীন

নীরবে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। তার মন বললে—এই সব চেয়ে বেশী মেনে নিয়েছে আমার কথাগুলো।

ঘর তার ভাল লাগে না। তাই ঘুরতে-ঘুরতে রবীনের দিন-রাত কাটে। কোথাও থেমে পড়ে, আবার ছুটে চলে। সেদিন রবীনের এক বন্ধু বলেছিল আপনি বাড়ী থেকে বের হবেন না!

—কেন? চমকে ওঠেন ভদ্রলোক।

—কারণ আছে, তাই বল্‌ছি। যদি বের্ হতে চান্, দরজায় রীতিমত তালা-চাবি দিয়ে বের হবেন! যখন ভেতরে থাকবেন, তখনও সদর দরজায় তালা-চাবির ব্যবস্থা করবেন, নইলে একদিন হায়-হায় করতে হবে। হাসতে-হাসতেই বলেছিল অভিনয় করে।

—তার মানে?

—মানে আর কিছুই না, সহজ কথা, মেয়েদের আজকাল পাখা গজিয়েছে! কোন সময় উড়ে যাবে কোন পথে ঠিকও পাবেন না।

ভদ্রলোক তখনই রেগে মারতে উঠেছিল রবীনকে। বেচারী পালিয়ে বাঁচে। একমাস পরে তার কথাই সত্যি হলো!

হিন্দু মেয়েরা পালায় সবার সাথেই। সে দেখেনা স্বজাতি-বিজাতি। দেখে না হিন্দু-মুসলমান, চীন, খৃষ্টান, মারাঠী, পাঞ্জাবী। এক্ষেত্রে বৈপরীত্য দেখা যায় মুসলমান মেয়েদের। তারা স্বজাত্যবোধ হারায় না। বিজাতিকে স্থান দিলেও স্বজাতি গড়ে নেয়। কোন হিন্দুমেয়ে তা পেরেছে?

রবীন হয়তো জানে না যে, ভালোবাসে যাকে—তাকে বিয়ে করতে মা-বাবার মত পায় না, তাই পালায়! কিন্তু এটুকু হয়তো নিশ্চয় জানে যে, চরমতর উন্মাদনার মুখে ছাই দেওয়া, আর ভালবাসা এক জিনিষ নয়। তাই পালিয়ে যেয়েও অদূরদর্শিতার ফলে তাদের ফিরে আসতে হয়, পায়না সমাজে স্থান। তখন খুলে যায় সুপ্ত তৃতীয় নয়ন, করে হাহাকার।

*

* *

আজ কয়েকদিন হলো রবীনের বাসস্থান বদল হয়েছে। অফিসের পাশেই একখানি বাড়ীতে তার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। তার বেশ ভালই হয়েছে বলা চলে। নিরিবিলি জায়গা। ফুল গাছ ঘেরা ঘর। চমৎকার লাগে।

দশটা বাজতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। রবীন সাড়া দিলে—হ্যালো!

ভেসে এলো সেই পরিচিত নারী কণ্ঠস্বর—কে রবীনবাবু বলছেন কি?

—হ্যাঁ, নমস্কার!

—আপনি কাল কিছু বলেছিলেন কি?

—বলেছিলাম, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন এবং ফোন্ করেছিলেন। তাছাড়া এমন ভাবে কথাগুলো বলেছি, যাতে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি বললেন আমি কোন্ দিকে তাল্ দেবো বলতে পারেন! তার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। কিন্তু আমার সংসার আছে। কল্‌কাতার বহু লোকের সাথে আমার পরিচয় আছে। সে আমাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে চায় ময়দানে, পার্কে রাস্তায়। দিন আর রাত তার কাছে সমান। তার কাণ্ড দেখে অন্যান্য লোকজন হাঁ করে চেয়ে থাকে। তবু সে ছাড়বে না। আমি যেন তার চাকর! সর্ব্বদাই আদেশ মেনে চল্‌তে হবে। কেন? সে আমার কাছে আশা করে খুব বেশী। কিন্তু তা পাবে না বলে দেবেন। এমনি ধারা অনেক কথা বললেন।

মাধবী কিছুক্ষণ নীরব রইলো। তারপর বললে—দেখা করবে তো?

—হ্যাঁ, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। যাবেন, তবে দু'একদিন পরে। বেশীক্ষণ আপনার সাথে কাটাতে পারবেন না।

—চিঠি পেয়েছে?

—না। আজ হয়তো নিশ্চয়ই আসবে।

—চিঠি পেয়ে কি বলে শুনবেন। আর আজ বিকেলে ঠিক চারটের সময় এস্‌প্লানেডে আমার সাথে দেখা করতে বল্‌বেন। ও আমায় শেখাতে চায় কর্তব্য-অকর্তব্য! আমি ভাল ভাবেই জানি, তাকেই শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। আজ আমার বন্ধু দেবীর বাসায় গিয়েছিলাম। সে শুনে বলে, তোর মত মেয়েকে ও চিনলো না, তবে ও চিন্‌বে কাকে! তোর মত বুদ্ধিমতী মেয়েকে শিক্ষা দেবে কে! শুনুন, একদিন দেবীর লাভার অপরেশবাবু রাগ করে বাসায় না এসে না খেয়ে-দেয়ে অফিসে শুয়ে ছিল। দেবীও যায়নি তাকে সাধতে। আমি তাকে গালাগালি করে পাঠালাম খাবার সাথে দিয়ে। যখন সে অপরেশবাবুকে বললে—ওগো আর রাগ করতে নেই, উঠে এসো। খাবার এনেছি, খেয়ে নাও। লক্ষ্মীটির মত সে হেসে উঠে এলো তার কাছে। তারপর সব ঠাণ্ডা।

রবীন একবার বল্‌তে চাইলো—যে ভালবাসা পরের কথার উপর খুব বেশী নির্ভর করে, সেটা ভালবাসা নয়, খেলা মাত্র! মুখে বললে —তাই নাকি! হেসে সায় দেয় সে। অনেকখানি তাকে জানতে হবে একালের মানুষকে। বুঝতে হবে আধুনিক কালের আবহাওয়া। তাই দু'জনের, কথায় সমর্থন করে চলতে হবে।

মাধবী বলে—বছরখানেক আগের কথা। আমার আর এক বন্ধু রীতা কী খেয়ালে ঝগড়া করে বিদায় দিয়েছিল তার লাভার সন্তোষবাবুকে। ভদ্রলোক নাকি কেঁদে ফেলছিল।

—কেন, ঝগড়া করলো কেন?

—সেটা অবশ্য রীতার দোষ। ভদ্রলোক মাইনা পেতো একশো টাকা। তাতে সংসার চালিয়ে ওর সাথে আমোদ-স্ফূর্তি করবার মত কিছুই থাকতো না। তাই ও—

—ও! হাসলো রবীন। যেন বিশেষ কিছু নয়! মনে মনে বললে—এরা শুধু প্রেমরসে তুষ্ট নয়, অর্থরস চায়! তারপর প্রশ্ন করে —আচ্ছা, আপনার বন্ধু দেবীর লাভার অপরেশবাবু বড়লোক বুঝি?

মাধবী একটু ঢোক গিলে উত্তর দেয়—না, এই পাঁচশো টাকা মাইনা পায়! এম, এ পাশ। বাড়ী ও গাড়ী আছে।

রবীন ভাবে—একেও একদিন বিদায় দেবে দেবী নির্মম আঘাতে। এও একদিন কাঁদবে! শুধু কাঁদবে না, বুকফাটা আর্তনাদ করবে। একদিন ঐ বাড়ীর ইঁট খুলে পড়বে। আর গাড়ীর পেট্রোল যাবে ফুরিয়ে। অবশেষে আসবে তার শোচনীয় দেহাবসান। একে নিয়ে একটু লুকোচুরি খেলা করছে। হাস্ছে, প্রাণ দিচ্ছে না। ডাক্ছে, পাশে বসতে দিচ্ছে না। আর সন্তোষবাবু নিশ্চই রূপবান ছিল। রূপের নৌকা ছেড়ে এবার এসেছে অর্থের নৌকায় তার মানসী রীতা।

—আপনার বেছে দেওয়া দ্বিতীয়া কাব্যখানি পড়েছি, বড় চমৎকার! প্রাণ আছে আপনার। যেদিন আপনার কথা প্রথম শুনলাম মোহনের কাছে, সেইদিন বুঝে নিয়েছি আপনি সামান্য কর্মচারী হতে পারেন, তবে উচ্চশ্রেণীর পুরুষ। আমাদের সম্বন্ধে আপনি যে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং মোহনকে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে আপনার সম্বন্ধে জেনেছি অনেক বেশী।

রবীন বাধা দেয় হেসে—উহুঁ! অত বেশী জানবেন না! আমি শিক্ষায়-দীক্ষায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সবার চেয়ে ক্ষুদ্র! সে গম্ভীর হয়ে এখন কথা বলবে না। দেখতে চায় তার স্বরূপ। পথের শেষপ্রান্তে যেয়ে পৌছাতে হবে হেসে-খেলে। চিনতে হবে সবাইকে। দেখতে হবে পাঁচবছরের বন্ধনটি সূত্রবিহীন কিনা।

—না-না, নিজেকে অত ছোট ভাববেন না রবীনবাবু। আপনিই একদিন বিশ্ববরেণ্য হবেন বলে দিলাম। আমার বন্ধুদের কাছে আপনার প্রশংসা করি। আপনার এত উচ্চ প্রাণ, ধারণা করা যায় না। ভাল কথা, ওর কাছে একটা কথা শুনলাম আপনার সম্বন্ধে, সেটা—পরিষ্কার করে বলতে সাহস পায় না।

রবীন হেসে উঠ্লো।—ও, বুঝতে পেরেছি! আপনি এর আগেও কয়েকদিন আমাকে এই কথাটি বলতে চাইছিলেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আজ তাই অপরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করলেন।

তবে মোহনবাবুর কাছে যা শুনেছেন, তা সব সত্যি নাও হতে পারে। আমার একটা মস্ত দোষ, প্রায়ই মেয়েছেলের দোষ ঢেকে বেড়াই। পরে বলবো সব।

—তা'হলে একদিন নিরিবিলিতে বসে সব শুনা যাবে। কি বলেন? হেসে বললে মাধবী।

তারপর নমস্কার বিনিময়ে যবনিকা পড়ে গেল। রবীনের মনে পড়ে একদিন রাতের কথা। কি একখানি জঘন্য শ্রেণীর বই দেখেছিল মোহনের হাতে। পড়তে দিয়েছিল মাধবী। সেদিন রবীন আর মোহনের 'নাইট ডিউটি' ছিল। রবীন বইখানি দেখতে চাইলো। দেখাতে চায় না মোহন। শেষে দেখাতে বাধ্য হলো। বললে—মাধবী আমাকে বারংবার নিষেধ করে দিয়েছে বইখানি আপনাকে দেখাতে।

রবীন বলেছিল—কেন?

—পাছে আপনি আমাদের সম্বন্ধে কিছুখারাপ ভাবেন, এই আশঙ্কায়।

—না-না, খারাপ কি ভাববো! উত্তর দেয়।

রবীন সে বই পড়েছিল। মাধবী যে জন্য বইখানা দিয়েছিল তার প্রিয়তমকে, রবীন জানে, সে আশা তার পূর্ণ হবে। বইখানিতে আগুন ছিল, ছিল ধ্বংস, ছিল পঙ্কিল পাপের বিভৎসতা। এমন অমৃত ছিল না, যাতে অমরতা লাভ করিতে পারে। সর্বনাশের ইঙ্গিত ছিল তার এই দানে।

রবীন সেদিন মনে মনে বলেছিল—মোহন তোমারও দোষ নয়, আর মাধবীরও দোষ নয়! দোষ কালের সময়ের।

একটু পরেই এলো মোহন। তখন এগারোটা বাজে। খবর জিজ্ঞেস করতে রবীন বললে—আপনাকে আজ চারটের সময় 'এস্প্লানেডে' দেখা করতে বলেছেন।

—না, আমি যেতে পারবো না! বলে মোহন।

—না-না, আপনার এরকম করা উচিত নয় মোহনবাবু। তিনি

কত আশা করে অপেক্ষা করবেন। আপনি নিজে ভুলতে পারেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। যেহেতু আপনি বিবাহিত, একজনের দ্বারা সঙ্গসুখ উপভোগ করছেন, আর তিনি একা। তাই আপনার উচিত তাঁকেও একটু আনন্দ দেওয়া।

রবীনের মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মানতে চায় না তাদের অধঃপতন। তারা যে পবিত্র নির্মল, এই কথাটাই তার মন বারংবার বলে। মধুর তাদের প্রেম। মহৎ তাদের অন্তঃকরণ সহজ তাদের ব্যবহার।

কিছুক্ষণ পরেই চিঠি এলো। খুলে পড়লো মোহন। মুখে হাসি ফুটলো। তারপর সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। রবীনের বড় সাধ হয়েছিল ঐ টুকরো চিঠি থেকে পাঠ উদ্ধার করে। অনেক কষ্টে কিছুটা জানতে পেরেছিল বৈকি। তাতে ছিল বিরহ ব্যথা, ছিল প্রেমের আকুলি-বিকুলি, শেষের দিকটায় ছিল পরপর কয়েকটি সংখ্যা। যার কোন অর্থ হয় না। তারও অর্থ ছিল, তবে বোঝে একমাত্র তারা দুজনায়। নিশ্চয়ই 'চুম্বন' হবে সেটা।

মোহন বললে—কাল নাকি ওর ছোট বোন চপলা বলেছে—দিদি, তুমি বন্ধুর বাসায় যাবার নাম করে সকালে কোথায় গিয়েছিলে ? আমি জানি তুমি মোহনের সাথে বেড়াও। মাকে বলে দিয়েছি, আজ বাবাকে বলে দেবো। দাদাও তোমাদের দেখেছে কয়েক-দিন ধর্মতলায়। এমনি ধারা আরো অনেক কিছু বলেছে।

রবীন এরপর যা শুনলো তাতে আবাক্ হয়ে গেল। মাধবী তার ছোট বোন মিনতিকে দিয়ে মোহনের সাথে চিঠি আদান-প্রদান করে। মিনতি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বয়স আট কি নয় হবে। তাকে মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখে। কাউকে বলে না সে। মাধবী যখন কোন কিছু অছিলা পায় না বের্ হবার, তখন মিনতিকে দিয়েই ওর বাবার অফিস থেকে ফোন্ করায় মোহনের কাছে। মোহন চলে যায়, মিনতিও ছুটতে ছুটতে এসে চারিদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দিয়ে যায় চিঠি।

তারপর সে আরো শুনেছে যে, মাধবীর কলেজে পড়বার একমাত্র কারণই হচ্ছে মোহনের সাথে অবাধ মিলন। তার জন্য তাকে অনেক ঝগড়া করতে হয়েছে। তাছাড়া সে যা টিফিনের পয়সা পায়, তাই জমিয়ে মোহনকে রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে খাওয়ায়। কিনে দেয় জামা কাপড়। নিয়ে যায় সিনেমায়। এমনি করে একটা আংটিও দিয়েছে তাকে।

রবীন গালে হাত দিয়ে ভাবে। এরা স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারে। একটা ঘুমন্ত ফুলের কুঁড়িতে কীট্ প্রবেশ করাচ্ছে। সুতরাং মিনতির পরিণামটা অকল্পনীয়। একদিন এ সম্বন্ধে তাকে জানতে হবে মাধবীর কাছ থেকে।

মাধবীর মা আরতী দেবী সেদিন বলেছিলেন—তুমি নাকি এখনও মোহনের সাথে বেড়াও!

অস্বীকার করেছিল মাধবী।—না-না, আমি আর দেখাই করিনে। তারপর কোথায় গেছে না গেছে তারও খোঁজ রাখিনে মা!

—কিন্তু ভুবন বললে যে, তোমাকে নাকি প্রায়ই সে দেখতে পায় মোহনের সাথে।

—দাদা মিথ্যা কথা বলে তোমাদের রাগায়। তোমরা তাই বিশ্বাস করেছো বুঝি।

আরতী দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে মাধবীর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করা হচ্ছে। ছেলেটি বেশ ভাল।

—মা, ওসব বাজে কথা বাদ দাও তো। প্রায় তাড়া দিয়ে ওঠে মাধবী—আমি এখন বিয়ে করবো না।

—বিয়ে করবে না কেন? যদি বিয়ে করতে আপত্তি করো, তবেই বুঝ্বো কোথাও কিছু ঘটেছে। কিন্তু মনে রেখো, এটা একটা বৈশাখী ঝড়। এখন আছে, আবার থেমে যাবে। ঝড়ের দাপটে অন্ধ হয়ে যে পথ ভুলে ফেলে এলে, সে পথ হয়তো জীবনে আর নাও পেতে পারো। এরপর অনুশোচনা আসবে। নিজের

উপর অবহেলার খেলা খেলবে। বাঁধনহারা চুলের মত এলোমেলো ভাবে কাটবে জীবন।

মাধবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলো। বললে—এখন বিয়ে করা আমার উচিৎ হবে না, মা। কারণ, আমাকে আই-এ পাশ করতেই হবে।

তুমি জানো মাধবী, উনি আমাকে দৈনিক বকাবকি করেন। আমিই নাকি তোমাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি, আমিই দিচ্ছি নাকি তোমাদের সাহস বাড়িয়ে।

—প্রতিবাদ করো না কেন?

—হ্যাঁ, প্রতিবাদ করতে যেয়ে মরি আর কি! মনে আছে, একদিন তোমারই জন্য আমায় কি শাস্তিটা পেতে হলো? নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে ছেড়ে ছিলেন! অত রাতে তোমার সেদিন আসা অন্যায় হয়েছিল। বল্‌লে তো শুনবে না! আমারও বিশ্বাস—তুমি মোহনের সাথে এখনও মেশো। সে নাকি কাল এখানে এসেছিল।

প্রতিবাদ করে মাধবী,—তুমিও এই কথা বললে, মা! আর সে যদি এখানে আসে, তবে দোষের কী হলো। এ অফিসে তার বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে, কিম্বা কাজও থাকতে পারে।

—না-না তাই বলছি। সরলপ্রাণা আরতী দেবী বিশ্বাস করলেন।

—মা, শোন, চপলার সাহসটা আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে। সেদিন তোমরা আমাকে বলছিলে মোহনের সম্বন্ধে, তারপর দেখি ও টিট্‌কারী দিচ্ছে। কি অসভ্য। আমি যে ওর বড়, গুরুজন সেকথাটা একদম্ ভুলে যাচ্ছে। তুমি বারণ করে দিও।

হেসে ফেল্‌লেন আরতি দেবী। চপলাও দূর থেকে এসব শুনে হাসছিল। এবার বললে—দেখেছিস তো?

—মা, ওর কথা আমি সহ্য করতে পারবো না—পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। তুমি সাবধান করো।

এবার আরতী দেবী সত্যিই চোখ রাঙিয়ে তেড়ে উঠলেন। পালালো চপলা।

মাধবী চপলার কাছে এসে বললে—দাঁড়া, এবার তোর সম্বন্ধে যা যা জানি, সব বলে দেবো! দেখি তুই দাঁড়াস কোথায়!

চপলা মুখ নেড়ে বললে—যাও বল্‌গে, কেউ বিশ্বাস করবে না!

*

* *

আজকাল রবীনের কাছে টেলিফোন্ আসে প্রায়ই। বাসস্থান পরিবর্তিত হওয়ায় মাধবীর পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ, রবীনকে প্রয়োজন তার প্রথমে। সে এখন চাবি। তার কথা দু'জনেই বিশ্বাস করে। মোহন তারই কথায় ওঠে-বসে রবীনের পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করতে যায় না।

রবীন একবার ভাবে মোহনের সাথে মাধবীর বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। ছলে-বলে-কৌশলে বিয়ে দিতে পারলে মোহন ভোগ করতো পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনেক ফন্দী এঁটেছিল সে। অনেকদিন ভেবেছিল তাদের সম্বন্ধে! মাধবীর দুঃখে দুঃখিত হয়েছিল সে। অসহ্যবোধ করেছিল মনে-মনে। কিন্তু সে ভেবে দেখলে যে, তা এখন আর হবার নয়। বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেছে। তাই দুটি পত্নী আইন বিরুদ্ধ। তা ছাড়া তার বৌয়ের উপর অবিচার করা হয়।

মাধবীর দিকে চেয়ে রবীন দিশেহারা হয়। কবে যেন কী সর্বনাশ করে বসে। তার মনের যে গতি, কোন এক অঘটন ঘটাতেও পারে। কারণ, অত্যন্ত সহজও সরল মতি। প্রেম সারা বুকখানিতে পরিপূর্ণ। তার সাথে নেই এতটুকু খেলার ছাপ। সে চেয়েছে প্রেম দিয়ে পুরুষের প্রেমসাগর মন্থন করে সুধা পান করতে। সে চেয়েছিল কোন প্রেমিকার মত কারো বুকের চিরস্থায়ী আসন দখল করতে। তার প্রেম ছিল অসীম, দিয়েছিল উজাড় করে, পেলো কিছুই না।

মাধবী জানেনা যে, মনের মানুষ কেউ পায় না। প্রেম তাই পথের ধূলিতে লুটায়, কাঁদে, মন পায় না তার। তাই থেকে যায় বিরাট ব্যবধান।

আজকাল সেই পরিচিত নারীকণ্ঠে প্রায়ই টেলিফোন শোনা যায় —"হ্যালো! কে বল্‌ছেন? রবীনকে ডেকে দিন না!

এ ফোন সকালে তুপুরে বিকালে যখন-তখন আসে। অফিসে যারা থাকে, তারা ডেকে দেয় রবীনকে সে মাধবীর টেলিফোন্‌ এলে উৎসাহ নিয়ে যায়। তার সাথে অনেক সুখ-তুঃখের কথা-বার্তা বলে। অন্যান্য সবাই তাদের আলাপ মন দিয়ে শোনে আর হাসে। তারা সবাই সন্দেহ প্রকাশ করে। কেউ কেউ হেসে বলে—আপনার মানসী বুঝি?

রবীন উত্তর দেয়—আমার এক আত্মীয়া।

তারা হাসে সে কথাটা উড়িয়ে দেয়। মানতে চায় না। তাই মাধবী টেলিফোন্‌ করলেই তারা হেসে বলে—কে বল্‌ছেন? মিস্‌ মাধবী বল্‌ছেন? কাকে চাই, রবীনকে?

উত্তর দেয় মাধবী হেসেই—হ্যাঁ!

মোহনের সম্বন্ধে রবীনের কাছে করে অভিযোগ। চায় তার সহানুভূতি, চায় সাহায্য। রবীনও তাকে আশ্বস্ত করে। কত হিতোপদেশ দেয়। করে কত প্রশংসা।

তেমনি রবীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে মাধবী। একদিন কথায় কথায় বললে—রবীনবাবু, আপনার গুণের সীমা নাই! আপনি অসীম, অনন্ত!

হেসে উঠেছিল রবীন। বলেছিল—মিছে কথা বলে মন ভোলাতে চাইছেন বুঝি! আমি ভাল করেই জানি যে, আমি অপদার্থ, নির্গুণ।

—না-না! অস্বীকার করে মাধবী।—আপনি আমার কাছে অনেক বড়। ভাই-বোন, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব সবার চেয়ে বড় আপনি। অনেক উচ্চে স্থান দিই আপনাকে!

সেদিন রবীন চমকে উঠেছিল। পরে বলেছিল—আমার উপর এতবড় অবিচার করবেন না। আমি বাস্তবিক পক্ষে আপনাদের সাথে কথা বলবার অনুপযুক্ত।

হয়তো রবীনের পক্ষে এটা বিনয়, কিন্তু তাতে যেন তুঃখিত হয় মাধবী। প্রবল প্রতিবাদ করে অসহ্য হয়ে। যেন কমলের বুকে বিষ-বাণ! রেগে অনেক সময় চুপ করে থাকে।

এরপর থেকে আস্তে-আস্তে রবীনের মনটা কেমন হয়ে গেল। মাধবীর সাথে একটু কথা বল্‌বার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কান পেতে বসে থাকতো সে আপনার ঘরে। যেদিন দেখা হত না, সে ফোন করতো না, সেদিন মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। রাগ হতো না, হতো অভিমান।

রবীন রক্ষক বটে, ভক্ষক নয়। সে শুধু পরীক্ষক। চুপে-চুপে অভিযান চালিয়েছে। মানুষ জানবার নেশা প্রবল। তাকে চিনবার নেশায় পেয়ে ধরেছে। সে জানে—মানুষের কথাতেই প্রমাণিত হয় তার আন্তরিকতা কতটুকু। সে কী ধরণের লোক। কে চায় অন্তঃকরণ, আর কে চায় দেহ, তা সে বোঝে। কারো বুঝতে দেরী লাগে না। যে পথ তুর্গম, সেই পথে সে পা বাড়ায়; যে পথ সহজ, সে পথে পা দেবার উদ্দীপনা নাই। অচেনাকেই সে চিনতে চায়, অজেয়কেই সে জয় করবার প্রয়াসী।

রবীন প্রায় মাসখানেক হলো ছাত্রী পড়াতে লেগেছে। মেয়েটি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। সকালে যায় রবীন। সেদিন ন'টায় পড়িয়ে আসতেই অফিসের এক ভদ্রলোক হেসে বললে—মাধবী আপনাকে অনবরত খুঁজে চলেছেন। তু'বার ফোন্ করেছিলেন, আবার ফোন করবেন বলেছেন।

স্নুতরাং রবীনও বসে থাকে ফোনের অপেক্ষায়। কিছুক্ষণ পরেই ফোন এলো। সাড়া দিলে রবীন—হ্যালো! নমস্কার!

মাধবী বল্‌লে—ওঃ, আপনাকে পাওয়াই কষ্টকর! কেউ বলতে পারে না আপনি কোথায়! তা যাক্, মোহনকে আজ ক'দিন দেখতে পাইনা কেন? আজকাল আমার সাথে যেন মিশতেই চায় না, আগের মত উৎসাহ দেখি না কেন? ওর কি হয়েছে বল্‌তে পারেন?

—পারি। যা হওয়া স্বাভাবিক।

—কী, বলুন!

—আমি অনেকদিন আগেই বল্‌তে চেয়েছিলাম কারণটা। পাছে দুঃখ পান, তাই বলিনি। ওঁর সেই প্রেমটা বিভক্ত হয়ে গেছে। তার একভাগ পাচ্ছেন আপনি, আর তিন ভাগ পাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী ও নবজাত শিশুটি।

—প্রেম কখনো ভাগ হয়ে যায় কি ?

—হ্যাঁ, হয়! আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, মোহনের যৌবনের প্রচণ্ড উন্মাদনার অবসান ঘটিয়েছিলেন আপনার সাহচর্যে। আনন্দে কালাতিপাত করেছেন। লম্বা-চওড়া বুলি দিয়ে শুধু আশাই পূরণ করেছেন, আপনার মত বাসা বাঁধেন নি। আপনার প্রেম দৃষ্টি, তাঁর কৃপা দৃষ্টি।

—তাহলে আপনি কি বল্‌তে চান সে আমাকে আজও সত্যিকারের ভাল বাসেনি? একটা হতাশার সুর জাগে তার কথায়। ঢেউ ওঠে তার অন্তর-নদীতে।

—ঠিক তাই! আপনাকে উপেক্ষার চোখে দেখেন। যতদূর বিশ্বাস তাঁর স্ত্রীর চেহারা আপনার চেয়ে ভাল। তাই যেটুকু মায়া জন্মেছিল, সেটুকু উঠে গেছে। তিনি আপনার সন্ধানে ফেরেন না, আপনিই অনুসন্ধান করছেন দিনের পর দিন। তাই আপনার কথা যখন চিন্তা করি, তখন বুকের ভেতর জ্বালা করে।

রবীনবাবু, আমার বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক মানুষের প্রাণে দয়া একটু থাকেই, এর কি কিছুই নাই।

—হ্যাঁ, ঐ দয়াটুকুই পান, প্রাণ পান না। যেমন আপেলের নাম করে, লাল টুকটুকে মাকাল ফল দেখানো। আপনারও উচিৎ এর সংসর্গ ত্যাগ করা। আপনি যদি আজ অন্যত্র বিয়ে করেন, তাহলে আপনার এই প্রেমটাও আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করবে। তখন চোখের সামনে সংসারে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর স্বামী, ননদ, সন্তান এদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হবেন অন্তঃ লজ্জা বা কর্তব্য কর্মের খাতিরে। একে ভুলে যেতে পারবেন কি ?

তা পারবেন না। কারণ, যেই একটু অবকাশ পাবেন, অমনি আপনার প্রাণ কেঁদে উঠবে। দু'চোখ ভরে উঠবে জলে। কারো কথা শুনলেই আবার সচেতন হয়ে উঠবেন আঁচলে চোখ মুছে। আবার কাজে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হবেন। আপনার হৃদয়-মন্দিরে তিনি অধিষ্ঠিত। তার উপর চাপা পড়বে অন্যান্য সকলে এবং সংসার। নতুনের আবির্ভাব পুরাতনকে ডুবিয়ে।

—কিন্তু আমি যে ওকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

—তাহলে এ জ্বালা আপনাকে চিরদিন বইতে হবে, এ অশ্রু নিত্য ঝরবে। চারিদিকে খুঁজবেন, নাম ধরে চীৎকারে আকাশ-পাতাল কাঁপাবেন, সাড়া পাবেন না।

মাধবী নীরব হলো। পরে বললে—কাল নাকি ওর ছেলের অন্নপ্রাশন! ওর বৌয়ের লেখা একখানা পত্র দিয়ে গেছে দাদার হাতে। আমাকে যেতে লিখেছে। মা পড়েই রেগে উঠলো। দাদা হাসলো। কিন্তু আমি যাই কি করে অতদূরে! সেদিন আমাদের সবার নেমন্তন্ন আছে আত্মীয়ের বাসায়। সুতরাং আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। পরে যাবো বলবেন। আজ এলে চারটের সময় গঙ্গার ধারে দেখা করতে বলবেন।

—তিনি তো ছুটিতে আছেন।

রবীন জানে যে, কোন কাল বা কুৎসিৎ মেয়ে অথবা ছেলে সবার কাছে অবজ্ঞা পেয়ে যদি একজনের কাছে পায় একটু ভালবাসা তার আন্তরিকতা, তাহলে সেই হতভাগ্যের মনে উল্লাসের সাড়া বয়ে যায়। মন ভাবে—সব চেয়ে বড় একটা কিছু লাভ করেছি। জীবন উৎসর্গ করে তখন সেই প্রেমদাতার শ্রীচরণে। ভেবে দেখতে সাহস পায় না—সত্যি এটা প্রেম কিনা। পাছে মন্দ একটা কিছু চোখে ভেসে ওঠে। হয়তো ভাবে—তারই মত সত্যিই সেও আপ্রাণ ভালবাসে।

তাই ভাগ্যহীন ছেলে-মেয়ে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছে যুগ-যুগ ধরে। তারা মরীচিকার পিছনে ছোটে জল ভেবে। অবশেষে

বেশী ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং অধিক পিপাসার্ত হয়ে বুকফাটা আর্তনাদ করে ফিরে আসে। ভয়াবহ নিঃসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

মাধবী বল্‌লে—বড় দুঃখ হয় রবীনবাবু, ও যখন তার বৌয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমার কাছে, তখন নীরবে আমি সব শুনি। কোথায় ফুলশয্যার রাতের কথা, কোথায় অন্যান্য দিনের আনন্দমুহূর্তের কথা, সব বলে। আর আমি মাথা নিচু করে শুনে যাই, কিছু বল্‌তে পারি না। বুক ফেটে যায় কান্নায়, চোখে জল আসে, কিন্তু সে থামে না।

রবীন একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। জ্বলন্ত নিঃশ্বাস। বলে তার জন্য দুঃখিত হবেন না। ওঁর বুদ্ধিটাই একটু কম। কোথায় কোন কথাটা বলা উচিৎ বা অনুচিৎ, তা তিনি বোঝেন না, যে এই কথায় শ্রোতার মনের কি অবস্থা হতে পারে। অত্যন্ত সরল লোক, আজকাল যাকে বলে বোকা।

—হুঁঃ! বোকা না হাতী! অত্যন্ত চতুর! মাঝে মাঝে চাতুরীর মাত্রটা হারিয়ে ফেলে। আঘাত পায়নি বলেই সে আঘাত দেয়, প্রেম কি জানেনা বলেই সেটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

—কিন্তু মনে রাখবেন এ ভুল একদিন তাঁর ভাঙ্গবেই! সেদিন কেঁদে কুল পাবেন না।

মধবী কিছুক্ষণ নীরব রইলো। তারপর বললে—কাল আপনি ওদের ওখানে যাচ্ছেন তো?

—আশা করছি।

—তাহলে আমার যাওয়া যে কেন সম্ভব হবে না, বলে দেবেন। আচ্ছা শুনুন, পরে একদিন যেয়ে ছেলেটাকে কিছু দিয়ে এলে হয় না? ধরুন একটা আংটি দিয়ে এলাম, আর তার বৌয়ের সাথে দেখাও করে এলাম! কেমন হয়?

—তাই করবেন! আর আমিও কাল বুঝিয়ে বল্‌বো।

মোহন একদিন মাধবীকে বলেছিল—দু'দশটা ডিগ্রী লাভ করলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। সবাই

তার অধিকারী হয় না। নিরক্ষর চাষীও অনেক সময় ডিগ্রীধারী পণ্ডিতকে ডিঙিয়ে যায়, মাধবী। বিদ্যার্জন আজকের দিনে নেহাৎ চাকরীর জন্য। জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়। তাই সব শিক্ষিতকেই শিক্ষিত বলতে পারি না। প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া চারটিখানি কথা নয়। আর জ্ঞানার্জনও গাদা-গাদা বই মুখস্ত করলে হয় না, মাধবী। সুতরাং নিজেদের বিদূষী ভেবে গর্ব করতে যোয়ো না।

মাধবী রেগে বলেছিল—কলেজের দরজায় পা দিতে পারোনি, তাই হিংসা। ওখানেই তোমার পরাজয় ও পতন।

মোহন হেসে বলেছিল—তাই অনেকটা শান্তি আর সন্তনা পাই।

রবীনের আজ বসে-বসে মনে পড়ে অনেকদিন আগের কথা। তখন সে ছিল গ্রামের বাড়ীতে। পড়া ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে পড়বার অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ সে আমন্ত্রিত হলো তাদের পাশের গাঁয়ের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে। তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য সহায়তা করতে। পাত্র দেখতে বহু জায়গায় মেয়ের বাবার সাথে ঘুরে অবশেষে ঠিক হলো সেই গাঁয়েরই এক ছেলের সাথে।

রবীন তাঁদের অনুরোধে দু'বেলা যাতায়াত করতে লাগলো। ভদ্রলোকের দুটি মেয়েই বিবাহোপযুক্তা। একটির বয়স ষোল, অপরটির চোদ্দ। তারা কেউ রবীনের সাথে কথা বলে না লজ্জায়। সামনে বের হতেও লজ্জাবোধ করে। গ্রামের মেয়ের যা হওয়া স্বাভাবিক।

বিয়ের ঠিক একদিন আগে ভদ্রলোকের প্রতিবেশিরা জানালেন যে, রবীন তোমার ওখানে নিশ্চয়ই কোন খারাপ উদ্দেশ্যে যায়, সব পরামর্শ নাও তার কাছ থেকে, আমাদের অবহেলা করো, তাই আমরা কেউ তোমার মেয়ের বিয়েতে জলস্পর্শ করবো না।

ভদ্রলোক হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন যে, তাকে আমিই অনেক অনুরোধে নিয়ে এসেছি—তার অভিজ্ঞতা আছে বলে। আর তোমরা যদি বিয়েতে না যাও, তাতে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। তবে মনে রেখো—রবীন চিরদিন যাবে।

বিয়ের দিন খুব হাঁক-ডাক লেগে গেছে! বাড়ীতে লোকজনে পরিপূর্ণ। কাউকে চেনে, কাউকে চিনতে পারে না। একটি লম্বা-চওড়া শ্যামবর্ণ বৌয়ের দিকে রবীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। বিয়েতে বিপক্ষদলের সবাই সপরিবারেই এসেছেন দেখা গেল। তাঁদের ভুল নাকি ভেঙ্গে গেছে।

রবীন উনুনের পাশে বসে চা তৈরী করছিল বরপক্ষদের জন্য। পাশে দাঁড়িয়ে সেই বৌটি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—উঠুন! আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি পাশে বসুন, আমি তৈরী করছি।

রবীন বাধা দিলে, কিন্তু টিঁক্‌লো না।

বৌটি চা তৈরী করতে করতে বললেন—কই, আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কে! লজ্জা করছে?

রবীন হাসলো। বললে—কি করে জিজ্ঞেস করি বলুন! শেষে তাড়া খাই আর কি।

অপরিচিতা হাসলেন—আপনার বুঝি বড্ড ভয়! তা ভালো কৈ, বললেন না, আমি কে!

রবীন বললে—হবে বুঝি তুমি কারো দয়িতা,

কারো একান্ত অবচয়িতা!

—হায় ভগবান! আপনি কবি নাকি!

—কিছুটা, সম্পূর্ণ নয়!

—জানি, ঐ দয়িতাকে পেলেই সম্পূর্ণ হয়। অভাব এখন সেই কোমলাঙ্গী ফুলমালিকা। তার স্পর্শ পেলে স্পর্শমণির মত জাগবে।

দু'জনে হেসে উঠলেন। বৌদি বললেন—এ বাড়ীতে আপনার দাদা কে? আমি তাঁরই তিনি, অর্থাৎ কুসুমিকা। যাকে বলে—তিনি ভ্রমর, আর আমি ফুল।

আবার একটা হাসির হুল্লোড় খেলে গেল।

রাত তখন বারোটা। খাবার বন্দোবস্ত চলছে। রবীন রান্না-ঘরের বারান্দা থেকে কলাপাতার বাণ্ডিল তুলতেই তার হাতে চকচকে কী একটা ঠেক্‌লো। তুলে চেয়ে দেখলে সোনার হার।

কিন্তু কার ? একবার সে জিজ্ঞেস করতে চাইলো সবাইকে। কিন্তু যার জিনিষ সে যদি না পায়। তাই সে কোচায় বেঁধে রাখলো। যার হার সে খোঁজ করবেই।

রাত সাড়ে চারটেয় শুয়ে আধ ঘণ্টা বাদে শয্যা ত্যাগ করতে হলো। রবীন মুখ-হাত ধুয়ে বসলো। তখনও হারের কথা কারো মুখে নেই। একটু পরেই হঠাৎ হৈ-চৈ পড়ে গেল—বৌমার হার কোথায় গেল !

আনন্দ-উৎসব এবং কর্ম্মের অপরিসীম আকর্ষণে মানুষ কোন কোন সময় ভুলে যেতে বাধ্য হয় নিজেকে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে, সেই সাথে জগৎকে। তাই বৌদি'ও হয়তো মশ্‌গুল্‌ ছিলেন।

বৌদির যিনি শ্বাশুড়ী তিনি ছুটে এলেন রবীনের কাছে। প্রায় কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় সব বর্ণনা করলেন। রবীন হাসি চাপতে পারে না। তারপর হার প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত করলো। তখন মেয়ে-পুরুষে সবাই মিলে তাকে অন্দর-মহলে নিয়ে গেলেন। আবার আনন্দের সাড়া বয়ে গেল ! বৌদি অর্থাৎ কুসুমিকাদেবী ছাদের উপর থেকে মুখ বের্ করে খিল্-খিল্ করে হাসছিলেন। রবীন হেসে বললে—শুধু হাসিতে পেট্ ভরবে না, মিষ্টি চাই।

এরপর যে ক'দিন কুসুমিকা দেবী ছিলেন, সে কদিন এই ঠাকুরপো'কে রেখে কোন কিচ্ছু খায়নি। কখনো বর্ষার জল কাদাময় গ্রামের পথে একটি ছাতা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন ছোট দেবরকে—রবীনকে ধরে আনতে। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করে যখন সে গিয়েছে, তখন বেলা প্রায় ন'টা। তারপর লুচি-সন্দেশ নিয়ে দু'জনে পরম আনন্দে খেয়েছেন। কুসুমিকার সাধ তবু মেটেনি। ছাড়তে চাননি এই নূতন পাওয়া দেবরকে। একই সাথে বসে খেয়েছেন। স্বামী নির্ম্মলবাবু হেসে বলেছেন—সাবধান গিন্নী ! আমায় কলা দেখিও না।

কখনো একহাঁটু জলকাদা ঠেলে বৌদি গিয়েছেন রবীনের বাড়ীতে —তার মায়ের সাথে দেখা করতে।

এরপর হলো ছাড়াছাড়ি। রবীন সেদিন কেঁদেছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো, আর ভাবতো বৌদির কথা। বৌদির ঠিকানায় কত দুঃখ করে পত্র দিয়েছিল! উত্তর পেয়েছিল সান্ত্বনার। এমনি ধারা পত্র আদান-প্রদান হতো। এক সময় কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন বৌদি। ঠাকুরপোকে যাবার জন্য কেঁদে-কেটে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু যেতে পারেনি বৌদির সাথে দেখা করতে। কুসুমিকা লিখেছিলেন —ঠাকুরপো মানুষের কাছে বলে বেড়ালেই ভালবাসা প্রকাশ পায় না। ভালবাসা মানুষের এমন একটা জিনিষ, যা কেউ বোঝাতে পারে না, দেখাতে পারে না। অথচ আছে, সাড়া দেয় অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে—এমনি এ রত্ন!

সেদিন রবীন এই কথাটা অনেক্ষণ ধরে ভেবেছিল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছিল—স্বর্গীয়! তোমার কথা সব সত্য। তোমার দূর থেকেই মঙ্গল কামনা করছি।

নিশীথ রাতের অন্ধকারের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে আজ রবীনের কত কথাই মনে জাগে। মোহনের কথা ভাবেতে ভাবতে মনে পড়ে রমেনের কথা! আহা, বেচারা কোন সুদর্শনা তরুণীকে দেখলেই বাক্স-বাক্স সিগারেট উড়িয়েছে! শেষে খাবার পয়সায় রীতিমত টান্ পড়লো! তবু থামেনি। হোটেলে নির্জ্জনতা লক্ষ্য করে চুপে-চুপে খেয়ে এসেছে ডাল-ভাত! পরেছে প্যান্ট-কোট-টাই।

রবীন বলেছিল—এসব কি করছিস? সে উত্তর দিয়েছিল—মন যে মানতে চায়না, ভাই!

সিগারেটের রাশি-রাশি ধোঁয়া কয়েকটি কুমারীকে অন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কত আপশোষ্ করেছে সে! আজ তার বিয়ে। তাই বার্ম্মা চুরুট টানছে। কিনেছে একখানা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বই। গিলছিল প্রাণপণে। পকেট গড়ের মাঠ। অন্তরে ঝড় উঠেছে! সেই ঝড়ে হয়তো দিকহারা হয়ে কোন আবর্ত্তের মাঝে পড়ে জীবন হারাবে।

মাধবীর সাথে মোহনের আবার মিল্ হয়েছে। বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়েছিল পিক্-নিক্ করতে। সঙ্গে ছিল মাধবীর বন্ধু দেবী, রীতা, চম্পা, আর ছিল তাদের নিজ নিজ প্রিয়তম।

এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে প্রাইভেট কার নিয়ে তাদের আস্তানার পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। দেবী বুঝতে পেরেছিল সে তার নব পরিচিত। কিন্তু কাউকে বলেনি। সে হেসেছিল। খুব আমোদে কেটেছিল সেদিন।

রবীনকে মোহন বলেছে যে, আগামী কাল সন্ধ্যার পর মাধবী আসবে রবীনের ঘরে। মোহন তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে। রবীন সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিল। তাই সে আজ তার নোংরা ঘরখানা আপন হাতে পরিষ্কার করে রেখেছিল। বাগান থেকে ফুল এনে ফুলদানী সাজিয়েছিল। তারা দু'জনে নিশ্চিন্তে নাকি একটু গল্প করবে।

মোহন এবং রবীনের অফিস আজ রাত ন'টা পর্য্যন্ত। এই সুবর্ণ সুযোগটা হেলায় হারাতে চায় না মোহন। তাদের সাথে ছিল আর একজন ভদ্রলোক। মোহন রবীনকে বলেছে—লোকটিকে নানা কথায় মাতিয়ে রাখতে।

সন্ধ্যায় একটি ফোন এলো। কথা বললো রবীন।

মাধবী বললে—কে, রবীনবাবু?

—হ্যাঁ! কি খবর?

—আমি আসছি, সাবধান! আর ওকে আপনাদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন।

যথা সময়ে সে এসেছিল। তারা আশ্রয় নিয়েছিল রবীনের ঘরেই। কেউ বুঝতে পারে নি। রবীন নানা গল্পের ভেতর মাতিয়ে রেখেছিল তার সহকর্মীকে।

রাত আটটার সময় মোহন বের্ হয়ে এসে বললে—রবীনবাবু আমি চললাম, শরীরটা ভাল না।

রবীন সহকর্মীর দিকে এক ঝলক চেয়ে বলেছিল—আচ্ছা যান, আমরা চালিয়ে নেবো।

একটু পরেই রবীন ঢুক্‌লো তার ঘরে। বাতি জ্বেলে দিলে। ঘরময় উগ্র আতরের গন্ধে ভরপুর। বালিশের উপর পড়ে আছে হু'টো রক্তগোলাপ। নাকের কাছে তুলে ধরলো। চমৎকার গন্ধ। অফুরন্ত আবেদন।

রবীন ভাল করে অনুভব করলো—তার বিছানা থেকে যেন আতরের গন্ধটা বের্ হচ্ছে। কী ভেবে যেন চ্‌মকে উঠ্‌লো সে। কেঁপে উঠ্‌লো তার প্রাণ। লক্ষ্য করলো আরো কিছু! ফিরে দাঁড়ালো দেওয়ালের শিব মূর্ত্তির দিকে। করযোড়ে দাঁড়ালো ভয়ঙ্কর সামনে। বারংবার ক্ষমা চাইলো। নিজেকে ধীক্কার দিল পুনঃপুনঃ। দু'চোখে তার ভরে এলো অশ্রু।

এরপর সাত দিনের ভেতর মাধবী মোহনের দেখা পায় না। এড়িয়ে চলে মোহন। একটা ঘৃণা এসেছে মোহনের মনে। অথচ মাধবী দিন-রাত রবীনকে ফোন করে বলছে তার সাথে মিলন করিয়ে দিতে। মোহনকে বুঝিয়ে বললে রবীন। কিন্তু সে তাতে রাজী নয়। সে বলে—না, তার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নাই, এই শেষ।

রবীন বললে—সে কি কথা মোহনবাবু। তিনি কত দুঃখ পাচ্ছেন! তাঁকে কাঁদাবেন কেন বলুন। যান না একবার—দেখা করে আস্থন! হয়তো তাতে আপনারও ভাল হবে।

একটু হাসলো মোহন। বললে—জানেন না রবীনবাবু মেয়েদের শেষ চাওয়া কি! তারা চায় না শুধু সাথে নিয়ে বেড়াতে, চায় না হাসি-ঠাট্টা, শুধু চায় কাম। তারা চায় সৃষ্টি করতে। জননী হবার সাধ তাদের রক্তের প্রতি অণুতে অণুতে লেখা আছে। পুরুষ নষ্ট করে, ওরা সঞ্চয় করে। পুরুষ ঘর ভাঙ্গে, ওরা বাঁধে। পুরুষ মুক্ত হতে চায় সংসার থেকে, ওরা তাদের পায়ে শেকল পরায়।

—কিন্তু ঘর ভাঙ্গে মেয়েরাই, পুরুষে নয়। সুখের সংসারে একটা স্বার্থান্বেষী বৌ এলেই যায় ঘর ভেঙ্গে।

—মনে রাখবেন, সে পরের ঘর ভেঙ্গে আপন ঘর বাঁধে।

রবীনের মনে পড়ে যায় একটি ছোট দৃশ্য। হাওড়া ষ্টেশনে বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসেছিল এক সন্নাসিনী। তার পাশেই ছিল দুটো প্রকাণ্ড ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের বোঝা। তার পরণেও একখানা কালো কুচ্-কুচে ছেঁড়া কাপড়। কী খেয়ালে একে-একে দু'টো বোঝা খুলেছিল। রবীন দেখলে—তার ভেতর একখানা ভাঙ্গা কড়াই, ঝাঁটা, ছেঁড়া কাঁথা, দুটো শামুক, কতকগুলো ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি, ভাঙ্গা থালা এমনিধারা আরো কত কি! বোঝা দুটোর ওজন এক মন হবেই। এখনও সংসারের মায়া সে এড়াতে পারেনি। তাই সে ওগুলোর মায়া আজও ছাড়তে পারে না।

রবীন মোহনের কথার জবাব দিলে—একথাটা আগে বোঝা উচিৎ ছিল আপনার। তাকে ভাসিয়ে দিয়ে পাড়ে বসে হাততালি দেওয়া উচিৎ হয়নি।

—বড় দুঃখ হয় রবীনবাবু, আপনিও ভুল বুঝছেন। যা শুনছেন তাই বিশ্বাস করছেন! আপনারা দাঁড়ি ধরেন বটে, তবে ওদিকটা বাঁচিয়ে ধরেন! ন্যায় বিচার করবেন। তার কথাই বিশ্বাস করবেন, আমার কথা বিশ্বাস করবেন না—এ কোন কথা নয়। আমি তাকে আর প্রশ্রয় দেবো না। সে এখন বিয়ে করবে না বাড়ীতে বলেছে। কাল নাকি এক ভদ্রলোক দেখতে এসেছিল, ও সেইজন্য সকাল থেকে পালিয়ে এসেছিল। তার সর্বনাশ হোক—আমি তা চাই না। ওর বিয়ে হোক্, সুখে ঘর-সংসার করুক এই আমি চাই। তাই আজ আমি চাই আপনার সহানুভূতি। আমার কথা হয়তো বুঝতে পারছেন। যা হয়েছে—তা হয়েছে, কিন্তু আর না। ওকে কাল যেতে বলে দিয়েছি, দেখা আর না করতে। যদিও সে হাত ধরে কেঁদেছিল। অনেক মিনতি জানিয়েছিল, কিন্তু টলিনি। এ সম্বন্ধে আপনার মতামতটা কী?

রবীন একটু ভেবে নিলে। পরে বললে—আমার অনেক দিন থেকেই বলবার ইচ্ছা ছিল—ওঁকে বুঝিয়ে বলে ত্যাগ করে আসুন!

কিন্তু এভাবে ত্যাগ করলে সহ্য করতে পারবেন না মাধব। দেবী। অত্যন্ত সরল প্রাণা! বিরাট আঘাত পাবেন তিনি। ফল খারাপ দাঁড়াতে পারে। এমন কি আত্মহত্যাও অসম্ভব নয়।

—তাহলে আপনি আমায় কি করতে বলেন?

—আপনাকে ওঁর সঙ্গ ত্যাগ করতেই হবে নইলে একটা বিরাট অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। বেশ, যখন এক সপ্তাহ দেখা দেননি, তখন আরো কিছুদিন আত্মগোপন করুন। তিনি কাঁদবেন জানি, শরীর ভেঙ্গে যাবে তাও জানি, তারপর চেয়ে দেখবেন তাঁর কেউ নেই—কিছু নেই। ভুলতে প্রায় বছর খানেক কেটে যাবে, তখন বাড়ী থেকে বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে নিরুপায় হয়ে তারই ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হবেন। কারণ, যে একবার রসগোল্লার স্বাদ পেয়েছে, সে রসগোল্লা খেতে চাইবেই। তাতে খারাপই হোক আর ভালই হোক!

—না-না, সে রকম ভাববেন না, রবীনবাবু।

রবীন হেসে বললে—না-না, আমি সেভাবে বলছি না। বলছি যে, আপনি যখন তাঁর আশা-সাধ মেটাতে পারবেন না, তখন সে সম্পর্ক ত্যাগ করাই ভাল। দু'জনেরই তাতে মঙ্গল সূচনা করবে। তখন তিনি বুঝবেন বিয়ে ছাড়া আর গতি নাই! তার বিয়ে যত দিন না হচ্ছে, ততদিন আপনার কোন ক্রমেই অব্যাহতি নাই, ততদিন আপনার স্বস্তি নাই।

মোহন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে—আমি তাকে শেষ পত্র দিতে চাই। যাতে সে আমাকে আর না চায়। সে যেন প্রাণভরে কাঁদতে পারে।

—না, ওভাবে নয়! এ অবস্থায় আপনি যত এড়াতে চাইবেন, তিনি তত আট্‌কে ধরবেন। পত্র দিতে পারেন, তবে অনেক বুঝিয়ে যুক্তি-তর্ক দিয়ে লিখেতে হবে।

—তাহলে আপনি লিখে দিন।

রবীন লিখে দিলে—অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে অম্লমধুর পত্র

লিখেছিল। তার নকল করে মোহন ফোন করলো মাধবীর আত্মীয় সেই কীরিটীবাবুর কাছে। সে এসে পত্রখানি নিয়ে মাধবীকে দিয়েছিল। মোহন অবশ্য সেই পত্রের ভেতর অনেক কঠিন বাক্যও সংযোগ করেছিল।

তার পরদিন সকাল ন'টায় পড়িয়ে এলো রবীন। অফিসের এক ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন—রবীনবাবু, তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার জন্য জবাবদিহি করতে আমাদের প্রাণ যায়। মাধবী ফোন করেছেন ইতিমধ্যে তিনবার। একটু পরেই আর একবার ফোন করবেন বলেছেন।

রবীন হেসে বললে—কি এত জবাবদিহি করতে হলো?

—আর বলেন কেন মশায়! প্রথমে ফোন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কথা। বললাম—কোথায় গেছেন বলতে পারি না। তিনি রেগে উঠলেন। বললেন—না, বলতেই হবে কোথায় গেছেন! আমাদের জানা উচিৎ। একটু সন্ধান করুন। বললাম —সম্ভব নয়! তখন তিনি অনেক অনুরোধ করলেন। বললেন—না-না, আপনারা আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন না, আমার বড় বিপদ, আমার সর্বনাশ হতে চলেছে। তাঁকে আমার চাই, এখনি চাই। আমার অনুরোধ, আপনারা তাঁকে খবর দিন, আমি লাইন ধরে আছি। বললাম—লাইন ছেড়ে দিন। তিনি এলে বলবো। তখন ছেড়ে দিলেন। আবার ঠিক পনেরো মিনিট পরে ফোন করেছেন। আমি বললাম—এখনও তিনি আসেননি। তিনি রেগে উঠলেন—কেন আসেননি! তাঁকে খবর দিতে লোক পাঠান নি! আপনি কি চালাকি পেয়েছেন? কে বলছেন আপনি? বললাম—আপনি কে বলছেন? আপনার ঠিকানা কি? তিনি আরো রেগে উঠলেন—আপনি কি আমায় অশিক্ষিতা পেয়েছেন? আপনি হতে পারেন অফিসার, আপনার চেয়ে অনেক বড় বড় অফিসার দেখা আছে। আপনি বুঝি আমাকে নিয়ে খেলা করছেন! আমার সর্ব্বনাশ, আর আপনার হাসি! বেশ, হাসুন, খুব হাসুন,

তবে রবিনবাবু এলে বলবেন তাঁকে থাকতে। ঘড়াং করে লাইন ছেড়ে দিলেন। এইতো অবস্থা মশায়।

অফিসের আরো পাঁচ ছ'জন শুনলেন। রবীন ফোনের অপেক্ষায় প্রায় আধ ঘণ্টা বসে রইলো। তারপর কোন মতে স্নানটা সেরে মেসে গেল খেতে। যাবার সময় বলে গেল—যদি ফোন করে, তাহলে বলবেন মেসে ফোন করতে।

ঠাকুর সবে মাত্র ভাতের থালা রবীনের সামনে ধরে দিয়েছে, ঠিক এমনি সময়ে খবর এলো—তার ফোন এসেছে! লাফ দিয়ে ছুটে গেল সে ভাত ফেলে। আশঙ্কায় রবীনের বুক কাঁপছে। কোন অঘটন ঘটলো কিনা কে জানে! মেয়েরা কলি, প্রজ্বলিত হলে হয় কালী!

—হ্যালো! নমস্কার! কি খবর? কিছু জানেনা এমনিভাবেই হেসে বললে রবীন।

—হ্যালো! আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন! ওঃ! আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না! আপনি শিগগীর আসুন! আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করবেন না। মঙ্গলা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসুন।

চম্‌কে যায় রবীন। কেঁপে ওঠে তার স্বর। বললে—সেকি। আমি সর্বনাশ করলাম—মানে! কি ব্যাপার?

—সব পরে শুনবেন, তাড়াতাড়ি আসুন!

—ভাতের থালা রেখে চলে এসেছি যে!

—থাক্, আপনি চলে আসুন সোজা! পরে খাবেন। আমার ভীষণ বিপদ। মাধবীর কণ্ঠে কেমন ব্যথার স্বর জেগে ওঠে।

—আচ্ছা, আসছি।

রবীন ভাবে, শুধু ভাবে। মাধবী শেষে বিষ খেলো নাকি! অসম্ভব কিছু নয়! মোহন আর কী কী লিখেছিল কে জানে!

দুটো ভাত মুখে দিয়ে পাঁচ মিনিটের ভেতর সে বেরিয়ে পড়লো। পথ যেন আর ফুরোয় না। বাস যায়, আর থামে। অফিসের সময়।

পথে লোক-জন আর গাড়ী-ঘোড়ায় পরিপূর্ণ। রবীনের চিন্তা হয়—যেয়ে তাঁকে কি অবস্থায় দেখতে হয় তা কে জানে! ভয়ে বুকটা ধক্-ধক্ করে।

বাসের বিলম্ব দেখে সে বাস থেকে নেমে পড়লো। আধ মাইল দূর্ থেকেই সে ছুটতে ছুটতে হাজির হলো সিনেমা হলের সামনে। দেখতে পেলো মাধরী কলেজের কয়েকজন বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। হাসলো মাধবী। বললে রবীনবাবু—কি হলো?

রেণু দেবী ও মাধবী রবীনকে নিয়ে এগিয়ে চললো একটা রেষ্টুরেন্টের দিকে। সেখানে একটি যিমেলস্ রুমে বসে পড়লো তিনজন।

রেণু দেবীই কথা তুললো—আপনার সাথে আমার এই প্রথম পরিচয়। অথচ আমাকেই এমন সব কথার অবতারণা করতে হবে, যা হয়তো উচিৎ হবে না। আর সেটা হবে শিষ্টাচারের বাইরে। তবু আমায় বলতে হচ্ছে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন না, তাতে কি আছে। রবীন ভরসা দেয়।

—ওর কি হয়েছে, তা হয়তো আপনি সবই জানেন।

—না, কিছু জানিনাতো। রবীন বিস্ময় প্রকাশ করে।

—কাল রাত থেকে ও উপোস্ করে আছে, জলস্পর্শ করেনি। আপনি এর প্রতিকার না করলে, কিছুই নাকি খাবেনা।

—সেকি। চমকে ওঠে রবীন। বয় আসতেই মোগলাই পরোটা এবং মাংসের অর্ডার দিয়ে বসে।

—না, আমি খাবো না। আমার খেতে ইচ্ছে নেই। বলতেই মাধবীর দু'চোখ জলে ভরে এলো। রুমাল বের করে চোখ মুছলে অনেক মিনতি করলো রবীন। অনেক বলে-কয়ে খাওয়ালো তাকে। খেতে প্রায় আধ ঘণ্টা লেগেছিল। একটু মুখে দেয় আর শুধু কাঁদে রবীন যত তাকে সান্ত্বনা দেয়, ততই কান্নায় ফুলে ওঠে।

খেতে খেতে রেণু দেবী বললে—আপনার ভরসা না পেলে ও খেতে পারছে না। জানেন তো ওর প্রেম কত গভীর কত নিবিড়।

—আমি বলছি—যথাসাধ্য চেষ্টা করবো মোহনবাবুর মতি পরিবর্তন করাতে।

রেণু দেবী বললে—ওর কত সাধ জীবনে, সব বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। চেয়ে দেখুন মাথার চুলের ভেতর লুকিয়ে আছে টক্‌টকে রাঙা সিঁদুর। যাকে সে মেনে নিয়েছে স্বামীত্বে, আজ তারই কাছ থেকে পেয়েছে শেষ পত্র অর্থাৎ চির বিদায়! একি ধারণা করতে পারেন! যে স্ত্রী বলে মেনে নেয় একটি মেয়েকে, সেই আবার লেখে—তুমি বিয়ে না করলে আমার সাথে দেখা বা কথা বলতে পাবে না।

মাধবী কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—আমি যার জন্য রাতদিন ভগবানকে ডাকি যার জন্য আমি আজও মা-বাবার কাছে লাথি-ঝাঁটা খাই, সেই লিখেছে—তুমি আমার কথা ভুলে যাও। আমি কারো কেউ নই। আপনি জানেন—ওকে বাঁচাতে যেয়ে মাকে কত দুঃখ দিয়েছি। ওরই জন্য আজ আমি পাপী, ওর জন্য আজ আমি লাঞ্ছিতা! অথচ কোন শিক্ষিত ছেলে-মেয়ের যা করা উচিৎ নয়, আমি ধৈর্য হারিয়ে তাই করেছি!

রবীন স্তম্ভিত হয়ে শুনে যায় তাদের কথাগুলো বললে—আগে আমি ছিলাম, বাড়ীতে একমাত্র আদরিণী, আজ আমি সবার কাছে উপেক্ষিত শুধু ওরই জন্য। যার জন্য চুরি করলাম, সেই আজ আমায় চোর বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে! একি কম অপমান, কম দুঃখ, রবীনবাবু আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

মাধবী আবার কেঁদে উঠলো রবীনের মুখে সান্ত্বনা বাণীর বিরাম নেই, অন্তরে নেই স্বস্তি। তারও চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

রবীন মাধবীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। বললে—

—আমি বুঝেছিলাম অনেক আগেই যে, এমন একটি ঘটনা ঘটবে। এমন কি এর চেয়েও সাংঘাতিক কিছু ভেবেছিলাম। আপনি পথের দিকে চেয়ে পা ফেলেননি, তাই কাঁটা ফুটেছে, উল্লাসে উর্দ্ধমুখী হয়ে এগিয়ে চলেছিলেন, তাই হোঁচট খাচ্ছেন। অনেক কাল কেটে গেছে, এখন ও কাঁটা বের হবার নয়। ব্যথা সইতেই হবে, পথ চলতেই

হবে, থামলে চল্‌বে না। অথচ ধিরস্থির পদক্ষেপে অচঞ্চল নয়নে পরিক্রমণ করুন! জানি এ ব্যথা সইবার নয়, তবু পুরস্কার ভেবে সইতেই হবে।

এক ঘণ্টা পরে রবীন্ তাদের সাথে বেরিয়ে এলো পথে। রেণু দেবী বিদায় নিয়ে চলে গেল। মাধবী রবিনের সাথে ট্রামে চেপে বসলো। পাশেই বসালো রবীনকে। তারপর এসপ্লানেডে এসে মাধবীর সাথেই উঠলো বাসে। তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরতে পারবে। আসল কথা-সে মাধবীকে ভালবেসেছিল মনে-মনে।

মাধবী বললে—আজ ভোর পাঁচটায় বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি রেণু দেবীর কাছে। সারারাত ঘুমাতে পারিনি। শুধু কেঁদেছি। মা বললে—তুই ছট্‌ফট্‌ করছিস কেন, কি হয়েছে! আমি কিছু সাড়া দিইনি।

রবীন বললে—অদৃষ্ট ছাড়া কি বলবেন একে! এও আপনার কর্মফল বলে মেনে নিতে হবে! দুঃখ করে লাভ কি বলুন! একটু থেমে একটি কবিতা বললে—

বুকের খাতায় যাহার ছায়া দিবস রাতি জেগেছে,
ছাপ্‌টি তাহার নিবিড় ভাবে রঙীন নেশায় লেগেছে।

বলে আপন মনেই হাসলো রবীন। মাধবী নীরবে তার দিকে চেয়ে থাকে। এক সময় রবীন বললে—আমি শয়তানকে ভয় করি না, শয়তানের শয়তানিকে ভয় করি। নারীকে ভালবাসি, নারীর কদর্য দীনতাকে করি ঘৃণা, ঘৃণা করি পুরুষের অপৌরুষতাকে। আর ভয় করি মিথ্যার বেসাতিকে।

রাত তিনটের সময় স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় রবীনের। দেখেছে তার প্রথম জীবনের রঙ ধরানো প্রেয়সীকে। যাকে প্রভাতে একবার না দেখতে পেলে দিন কাটাতো না। দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো নিজে। সেই মনা আজ সপ্নে দেখা

দিয়েছে দীর্ঘ সাত বছর পরে। ভারী দুষ্টু ছিল সেই মনা, আর ছিল মুখরা।

ওর যখন বিয়ে হলো, তখন রবীনের আনন্দ আর ধরে না। বয়স তখন কতইবা হবে? সতেরো কি আঠারো মাত্র। সে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল ওদের বাড়ী-ঘর আর বিয়ের বাসর। কিন্তু মনা ছিল গম্ভীর। মুখ ভার করে বসে থাকে ঘরের একোণে-ওকোণে। ডাকলেও কারো সাথে কথা বলে না। সেদিন তার দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না রবীনের। সে ফুলে ফুলে সমস্ত বাড়ীটা সাজিয়েছে।

যখন মনার পাশ দিয়ে গেছে, তখন তাকে দেখে পেছন ফিরে বসেছে তার প্রেয়সী মনা। তাই দেখে রবীন হাসতে-হাসতে তার এই সমবয়সী বান্ধবীকে বলেছিল—কিরে, আজকের দিনে মুখ ভার করে বসে থাকিস কেন, বোকা?

অমনি দেওয়ালের পাশ থেকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল রবীনকে। বেচারা পালিয়ে বাঁচে সে যাত্রা! দূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে—কী অন্যায় করেছি যে, মারতে এলো! এক সময়ে তার দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

ঠিক তখনই চেয়ে দেখে—সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে মনা। রবীন তা দেখে হেসে ফেলেছিল। আবার কাজে মেতে উঠেছিল পরম উৎসাহে। আর মাঝে-মাঝে দেখে আসে তার প্রিয়াকে। কি করছে সে? হাসছে না কাঁদছে!

পরদিন গোধূলী লগ্ন। মনা বিদায় নিয়ে যাবে। জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ চল্‌ছে। রবীন দাঁড়িয়েছিল বাইরে। রওনা দিল বরপক্ষ মনাকে নিয়ে। পিছু-পিছু গেল মেয়ের মা, ভাই, বাবা, কাকারা।

শ্রাবণের পরিপূর্ণ নদীতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সহসা তেমনি ঢেউ খেলে গেল রবীনের বুকের ভেতর! কূলে নৌকা বাঁধা। তাতে বরপক্ষ উঠতে ব্যস্ত হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়লো মনার বন্ধু রবীন। প্রায় পঞ্চাশ জনের ভেতর সে ক্রমাগত নিরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিল। চাঁপতে

যেয়ে যাতনায় দম্ আটকে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কোনমতেই সেদিন সংযত করতে পারেনি নিজেকে। কিশোর মনের সহজ প্রেম সেদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

সেদিকে সবাই চেয়ে ছিল বিস্ময়ে। চেয়ে ছিল ঘোমটার আড়াল থেকে মনা। তারও দু'চোখ বেয়ে ঝরছিল অশ্রুধারা।

নির্দ্দয় পাত্র পক্ষ নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন ভ্রূক্ষেপ না করে। একে একে সেখান থেকে বিদায় নিয়েছিল সবাই। শুধু বসে ছিল সেই ভরা নদীর কূলে একা রবীন। চেয়েছিল একদৃষ্টিতে ঐ পাল তোলা বড় নৌকার দিকে! সেদিন বুক ফেটে চুরমার্ হয়ে গিয়েছিল অসহ্য বিরহ-ব্যথায়। দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছিল নিজের বুকখানা।

ঢেউয়ের বুকে দুলতে-দুলতে নৌকাখানি দূর্ থেকে দূরান্তে ভেসে চলেছিল। সেই সাথে ভেসে চলেছিল রবীনের কাঁচা প্রাণটা। দূর্ থেকে দূরান্তে চলছিল নৌকটার পিছু-পিছু।

পশ্চিমাকাশে সূর্য্য ডুবে গেছে। তার শুধু স্মৃতি রয়ে গেল ঐ অস্তাচলে। ওদিকটা একেবারে লাল হয়ে গেছে! লাল হয়েছে রবীনের বুকখানা। স্মৃতি ছেয়ে রইলো প্রেয়সী মনার। তারপর এক সময় বাঁকের আড়ালে হারিয়ে গেল পাল তোলা ঐ নৌকাটা। নদীর কুলে তৃণশয্যায় এলিয়ে পড়লো রবীনের দেহ। অশ্রুর ঢেউ এসে বারংবার ঘা দিচ্ছিল তার বুকে। সেই সাথে নদীর বুকেও শোনা যাচ্ছিল উত্তাল ঢেউয়ের ঘাত-প্রতিঘাত।

সন্ধ্যা নেবে এলো শ্রান্তির প্রশান্ত কালিমা ছড়িয়ে। আকাশে ফুটে উঠলো সহস্র তারকা। আর জোনাকী ফিরলো ছোটাছুটি করে। শুধু ছুটলো না সেদিন রবীন। আকাশের বুকে দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলো। খুঁজে ফিরলো তার হারিয়ে যাওয়া পাখী। কোথায়, কত দূরে গেছে সে কে জানে?

সেদিন রাতে কখন সে বাড়ী ফিরেছিল, তার জানা ছিল না। এক সময় কি একটা প্রচণ্ড শব্দে চম্‌কে উঠেছিল। থেমে

গিয়েছিল চিন্তা। আস্তে-আস্তে উঠে টল্‌মল্‌ করে ফিরেছিল ঘরে। রাতে খায়নি, কারো সাথে কথা বলেনি।

তারপর অনেকদিন পরে আবার দেখা হয়েছিল মনার সাথে। তখন মনা একা ছিল না। কোলে ছিল কচি মেয়ে। রবীনের কোলে তুলে দিয়ে হেসে বললে—এর একটা নাম রাখো!

রবীন বললে—এর নাম থাক তবে রত্না!

তা শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠে ঐ গোলাপ ফুলের মত কচি মেয়েটা! হাসে রবীনের হৃদয়াকাশ!

মনা বলেছিল—তোমার নামকরণ সার্থক হোক।

কৈশোর থেকে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত এদের মাঝে ছিল প্রগাঢ় প্রেম। উভয়েরই বড় আমবাগান ছিল। ঝড়ের দিনে রবীন নিজের বাগানের আম ফেলে ওদের বাগানে গিয়ে ওকে কুড়িয়ে দিয়েছে রাশি-রাশি পাকা আম। ওর মা'ও জানতো এদের প্রেমের কথা। বুঝে ছিল রবীনের মা।

* *

*

রবীনের কয়েকজন বন্ধু বলেছিল—সাবধান, রবীনবাবু! উদোড় পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপতে পারে! তখন কাঁধ থেকে নাবাতে পারবেন না সে বোঝা। নিমজ্জিত হতে বাধ্য হবেন, প্রেম সাগরে ঘূর্ণিপাকে। তখন ভবিষ্যৎ ভেঙ্গে পড়বে।

উপেক্ষার হাসি হাসে রবীনবাবু। সে যেন পাষাণ!

তার টেলিফোন এলো বেলা ঠিক বারোটায়।

মাধবী বল্‌লে—ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ! আপনি কেমন?

—বুঝতেই পারছেন। আজ আপনার নাইট ডিউটি আছে।

—কি করে জানলেন?

হাসলো মাধবী। বলেল—আপনাদের ডিউটি আমিও যে ঘরে

তৈরী করি চুপে-চুপে, সে খবর রাখেন না বুঝি! যে নিয়মে আপনাদের 'ডিউটির' পরিবর্ত্তন হয়, সেটা আমিও জানি।

—আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আর একবার নমস্কার করি। হাসলো রবীন। বললে—ইউ আর এ জুয়েল আই সি! নট এ সিম্প্ল গার্ল, ইউ আর এ জিনিয়স্ ইন্ থাউস্যাণ্ডস্! আই হ্যাভ নেভার সিন্ এ গার্ল লাইক ইউ, হু নোস্ দি রিয়াল লাভ্! আই মীন ইউ আর এ গডেস্ অব লভ্!

মাধবী শুনে একটু হাসলো। বললে—হুঁ! আপনি তো বলেন, কিন্তু আপনার বন্ধু তো স্বীকার করে না।

—একদিন একথা তিনি মানতে বাধ্য হবেন। সেদিন মনে হবে—গাছ থেকে ফুল তুললাম, দু'বার নাকের কাছে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, অথচ তার মর্যাদা দিতে পারলাম না।

মাধবী কিছুক্ষণ নীরব রইলো। তারপর বললে—ও শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে কি? আর আমি যে চিঠিটা দিতে বলেছিলাম আপানকে, সেটা দিয়েছেন? চারটের সময় আসবে তো?

—যত দূর সম্ভব ফিরে এসেছেন! তবে কাল গিয়ে দেখা পাইনি। আজও দুপুরের রোদে পুড়ে কষ্ট করে গিয়েছিলাম, আজও দেখা পেলাম না। তবে একখানা কাগজে লিখে ঘরের তেতর ফেলে দিয়ে এসেছি, আর পাশের বাসায় একটি ছেলেকে বলে এসেছি।

—ওর জন্য কয়েকটা জিনিষ কিনেছি। যাক্ আজ আপনার সেই জীবন কাহিনীটা শুনবো। আসুন তিন্টায় এস্প্লানেডে। আমি অপেক্ষা করবো। অবশ্য ভুলে যাবেন না, আপনার বড্ড ভুল হয়।

রবীনের মনে পড়ে মোহনের একটা কাহিনী। প্রায় সাত বছর আগের কথা। তখন সে অন্য এক অফিসে কাজ করতো। তাদের সাথে কাজ করতো আর একটি অবিবাহিতা মেয়ে। মেয়েটির সাথে ক্রমে-ক্রমে বেশ ভালবাসা জমে উঠেছিল। একদণ্ড এ ওকে না দেখলে থাকতে পারতো না। কাজ করতে-করতে রাত হলে মোহন ট্যাক্সিতে তাকে তুলে পৌছে দিয়ে আসতো বাসায়। খাবার এ ওকে

না দিয়ে খেতো না। দু'জনের ভেতর উঠেছিল প্রচণ্ড মাতামাতি। একদিন রাতে মোহন দেখতে পেলো মেয়েটি অফিসের বড়বাবুর গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছে। অকৃতদার বড়বাবু তার কাঁধে হাত রেখে গল্প-করতে-করতে চলেছেন! ঠিক তার পরদিন মেয়েটি পুনরায় মোহনের সাথে প্রেমালাপ করতেই মোহন ক্রোধে ফেটে পড়লো। অনেক ধীক্কার দিয়েছিল তাকে। তার কিছুদিন পরে নাকি মেয়েটার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়।

তাই শুনে রবীন বলেছিল—মোহনবাবু! এ যুগ বড় সাংঘাতিক। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়ে যাবেন, সেই হেসে পকেট থেকে ছুড়ি বের্ করে বুকে আমূল বসিয়ে দেবে নির্বিবাদে! সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই এমন কাউকে বেঁধেছে, যার মাসিক অর্থের অঙ্ক কম পক্ষে চার সংখ্যায় উঠেছে। জানেন, আপনি কোন পদে কাজ করছেন, এ দেখতে যাবে না বা বিচার করবে না; আপনি কত টাকা মাইনা পাচ্ছেন এটাই সবার লক্ষ্যনীয়। মোট কথা টাকা, চাই টাকা! আপনার উপার্জন দেখে আপনার মূল্য নির্ণয় করা হবে।

মোহন বলেছিল—ঠিকই বলেছেন রবীনবাবু।

রবীন বলে—তাই আমি সেদিন আপন মনে বলে চলেছিলাম—ওরে, তোর অর্থ নাই তুই ফিরে আয় ঘরে! মায়ের ধন মায়ের কাছে আয়! তোর জন্যে প্রেম নয়! প্রেম ধনীর জন্য, তারই সাজে। তার গাড়ী, বাড়ী, ধন-জন সব আছে তারই জন্য আছে প্রেম। ও গরীবের জন্য নয়। গরীবের কাছে ও থাইসিস্। মরতে হবে শেষে, অথচ কেউ তোর জন্য একটু চোখের জলও ফেলবে না। যাকে তুই ভালবাস্তিস্; সেই এসে তোর চিতার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু হাস্‌বে আর নাচবে! কেমন ঠিক নয় মোহনবাবু? এর বড় আর কি আশা করেন? না হয় বাঁশ দিয়ে দুটো ঘা মেরে মনের সাধ মেটাবে।

সেদিন মোহন আর একটি কথাও বল্‌তে পারলো না। নীরবে উঠে চলে গিয়েছিল। হয়তো আড়ালে যেয়ে কেঁদেছিল!

রবীন যেয়ে পৌঁছুলো ঠিক তিনটে পনেরোয়। কার্জন পার্কে

আম গাছের নীচে বসেছিল মাধবী। রবীনকে দেখ্‌তে পেয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো সে।

—এত দেরী কেন? অনুযোগ করলে মাধবী।

—কাজ সেরে আসতে দেরী হলো।

—ইস্‌, একটু আগে এলেই একটা মজা দেখতে পেতেন, আর তাকেও মজা দেখিয়ে দিতাম।

—কেন, কী ব্যাপার?

—একটি ছেলে আমার পেছনে লেগেছিল অনেকক্ষণ যাবৎ। 'মেট্রোতে' গিয়েছিলাম ছবি দেখতে আর সময় কাটাতে। সেখান থেকে ছেলেটি আমার পেছনে লেগেছে। পার্কে এলাম, সেও আমার পেছনে-পেছনো এলো। আমি বসলাম, লোকটি ঘুরতে লাগলো। তারপর একটু দূরে সেও বসে পড়লো, সেই সাথে শিস্‌ দিয়ে চল্‌লো। কখনো রুমাল বের্‌ করে ডাকলো, আবার একটু হাসলো। দেখ্‌লো অন্যান্য সবাই। আমি লজ্জায়-দুঃখে মাথা নীচু করে রইলাম। ওদিকে আর চাইলাম না। মিনিট পাঁচেক আগে চোখ তুলে দেখি সে নেই! নিরাশ হয়ে ফিরে গেল বেচারা।

—আহা-হাঃ, বিরাট ভুল করলেন! তার দিকে চেয়ে একটু যদি হাসতেন, তাহলে বেচারা আশায়-আশায় থেকে যেতো। আর আমিও এসে শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

রবীন দুঃখ করলো সে জন্য।

মাধবী বললে—না-না, আমার দ্বারা ও সব সম্ভব হবে না, রবীনবাবু। তাহলে অন্যান্য লোকগুলো আমাকে সত্যিই খারাপ ভাবতো।

—সেটা অবশ্য ঠিক।

হাঁটতে-হাঁটতে যেয়ে তারা বসলো দূরে এক বট্‌গাছের তলায়।

রবীন বললে তার কাহিনী। তাকে বীণা নামে একটি মেয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল। এই তাদের প্রথম দেখা। উপলক্ষ্য ছিল এক বিয়ের। মেয়েটির সাথে তার অনেকদিন থেকে বিয়ের

প্রস্তাব চলছিল। কথাটা তুলেছিলেন তার ভগ্নীপতি। রবীন রাজী ছিল না। কারণ সে না দেখে কাউকে বিয়ে করবে না। যখন সে শুন্‌লো যে, এই হচ্ছে সেই বীণা, তখন একটা স্বাভাবিক সংকোচে দশহাত দূর দিয়ে ঘুরছিল।

ফুলশয্যার রাত। রবীন সেই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট টান্‌ছিল। মেয়েটি এসে বসেছিল—আমাকে ঘৃণা করেন কি, রবীনবাবু? কেন, অপরাধ কোথায়?

রবীন উত্তর দিতে পারেনি। একটু হেসেছিল। বীণা বলে —না, হাসলে চলবে না? আপনি আমাকে দেখলে পালিয়ে চলেন কেন? আমি কি কোন ক্ষতি করেছি? কাহিনী বল্‌তে বল্‌তে একটু থামলো রবীন।

মাধবী বললে—থামলেন কেন?

রবীন আবার বলে যায়—এরপর সে আমার মৌনব্রত ভঙ্গ করালো ক্রমে-ক্রমে নানা কথায় আঘাত দিয়ে! তারপর কাদা-জল ছিটালো, দামী আতর মাখালো। কত মন ভুলানো কথা বললো। একে বারে ভূত বানিয়ে ছেড়ে দিলে দুদিনের ভেতর।

—মন ভুলানো কথাগুলো কী?

—সেগুলো তো আপনাদের অবিদিত নেই!

—তবু বলুন না?

রবীন একটু হাসলো। বললে—আপনাকে যদি কেউ বলে—আহা কী চমৎকার চেহারা! যেন স্বর্গ হতে নেবে এসেছে অপ্সরী! চোখ ফেরানো যায় না! আপনি হয়তো কথাটাকে তেমন প্রশ্রয় দেবেন না, কিন্তু আপনার মনটা চুপ করে চেপে ধরবে তাকে। বিরাট সান্ত্বনা পেলো সে! তেমনি পুরুষকে যদি বলে—আপনাকে মনে হয় স্বয়ং মহাদেব বা কৃষ্ণ! ব্যস! একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। তারপর যদি কেউ বলে হাত চেপে ধরে—আজ যেতে পারবেন না, রাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে থাকতে হবে। ব্যস্! এর চেয়ে সেরা অস্ত্র আর সাথে যদি—

—বাঃ খেয়ে-দেয়ে সবাই তো শুয়ে থাকে।

—যদি বলে আমারই বিছানায়, আমারই পাশে।

মুখে রুমাল দিলে মাধবী।

রবীন রাজী হয়নি। ফলে বেপরোয়া হয়েছিল সেই উন্মাদিনী। প্রকাশ করলো রবীনের কাছে—মানুষ যে এত বড় নিষ্ঠুর হয় জানতাম না। আমি আপনাকে চাই, আর আপনি আমায় অবহেলা করেন। এত বড় ব্যথা দিলেন!

রবীন বলেছিল—দেখ, উন্মাদনা বা খেয়ালের বসে একটা কিছু করা উচিৎ নয়। সব কিছু ভাল করে বুঝতে হবে। কারো প্রাণ নিয়ে খেলা করতে চাই না। এই খেলা কারো ক্ষতি করতে পারে অবশেষে। ভুলে যেয়ো না সে কথা, বীণা!

করলো ঠিক তাই। সে রাতে থাকলো না। বিদায় নিয়ে চলে যেতেই অন্ধকার সিঁড়িতে পথ আগলে ধরেছিল উন্মাদিনী বীণা। পারেনি ঠেকাতে। আবার পরদিন সকালে রবীন গিয়েছিল। চা এনে দিলে মেয়েটি। রবীন সারাতাত ঘুমাতে পারেনি। শুধু ছট-ফট্ করেছে। কেন সে তাকে আঘাত দিচ্ছে! কোথায় তার দোষ। একে আঘাত দিয়ে কী এত সুখী হবে? কে সে? কে মানে, কে চেনে তোমাকে? এত গর্ব কেন? আজ বাদে কাল তোমার এই দর্প মুছে যেতে পারে, মিলিয়ে যেতে পারে তোমার রক্তে মাংসে গড়া দেহ। তবে কেন চাও তাকে কাঁদাতে? তোমরা যদি ওদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারো, তাহলে ও ফুল শুকিয়ে মরে ঝরে যাবে আর অভিশাপ দেবে!

তাই চা খেতে-খেতে রবীন বীণাকে বলেছিল—শোন, আজ শুনলাম তোমার নাকি অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—যদি আমাক বিয়ে করতে চাও, তাহলে ঐ আশীর্বাদী আংটী ফেরৎ দিতে হবে। পারবে তো? বলেছিল রবীন।

কিছুক্ষণ মেয়েটির মুখে কথা ফোটেনি! অন্য দিকে চেয়েছিল।

—উত্তর দাও!

—না।

—নাঃ! চমকে ওঠে রবীন। বুকখানা তার ব্যাথায় ফেটে গেল। আগুন জ্বলে উঠেছিল বুকে। রক্তের অণুতে-অণুতে তার ঢেউ খেলে গেল! ভয়ঙ্কর তার মূর্ত্তি।

বললে সে—তবে তুমি কী চাও?

—শুধু বন্ধুত্ব! আপনি আমার বন্ধু!

ক্রোধে ফেটে পড়লো রবীন।—বন্ধুত্ব না উপপতিত্ব? কোনটা? তুমি যা বলেছো, এসব কি বন্ধুত্বের নিদর্শন! না, তুমি খুঁজে চলেছো একজন উপপতি!

সেদিন জ্বলে বেরিয়ে পড়েছিল রবীন। ছ'মাস সে কেঁদেছিল। ভুলে গিয়েছিল আহার নিদ্রা। হাড় ক'খানা ছিল তার পুরস্কার। লোকে ভয় পেয়েছিলি তার চেহারা দেখে।

মাথা নীচ করলো রবীন। হয়তো তার চোখে জল এসেছিল ভরে। মাধবীর মুখখানা কালো হয়ে গেল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো। দু'জনে কিছুক্ষণ নীরব।

সান্ত্বনার সুরে বললে মাধবী—সেজন্য দুঃখ করবেন না! পুরুষ বা মেয়ের ভেতর এমনি ধারা কতকগুলো থাকে, যারা প্রাণ নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে, যারা সাময়িক ভাবে আনন্দ করতেচায়, তার কোন কিছুর গুরুত্ব দিতে চায় না। কারণ, নিজেরা তুচ্ছ ভেবেই অপরকেও তাই ভেবে বসে!

রবীন ফিরে চাইলো।

মাধবী বল্‌লে—মোহন ঐ শ্রেণীর। আপনার ব্যথা আমি বুঝি আমার ব্যথা আপনি বুঝতে পারছেন! দোষ আমাদের মত সহজ মানুষের।

ঘরি দেখে মাধবী বল্‌লে—উঠুন! চারটে প্রায় বাজে। মোহনের আসবার সময় হলো।

দু'জনে এলো এস্‌প্লানেডে।

রবীন তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে বলে নমস্কার বিনিময়ে চলে গেল আপন কাজে।

বাসে চড়ে যায় সে। যেতে চোখে পড়ে কতকগুলি হিন্দুস্থানীর বৌকে। তারা ট্রাম লাইনের ধারেই কাঠফাটা রোদে ঘটির জল রাস্তায় ঢেলে দিলে। তারপর প্রত্যেকে এক-এক টুক্‌রো ন্যাকড়ায় আগুন জ্বেলে গড় হয়ে প্রণাম করলো প্রায় দু'মিনিট। পেছনে বাস ট্রাম এসে থেমে গেল। তাদের ভক্তি টললো না। হয়তো রাস্তার মুখে আগুন দিলে, যাতে তাদের স্বামী-পুত্রের অমঙ্গল না হয় পথের মাঝে! পথ দেবতার মাথায় জল দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করলো। হবে হয়তো এমনি ধারা কিছু।

হায় ভক্তি! অন্ধ ভক্তি তবু ভালো। বিশ্বাস আছে যেখানে, সেখানেই সিদ্ধিলাভ। নকল মায়ের ভেতর আসল মাকেও পাওয়া যায় দৃঢ়বিশ্বাসের বলে। তেমনি নিশ্চয়ই গাছ বা পথের ভেতরও পাওয়া যাবে উপাস্য দেবতাকে। যে বেশী শিক্ষিত যে বেশী বোঝে, তার মনে নানা রকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাই লাভ করতে পারে না একবারেই তার উপাস্যকে। সে মনকে নিয়োগ করতে পারে না একভাবে যতক্ষণ না তার সন্দেহ দূরীভূত হয়।

রবীনের ভাবনার শেষ নাই। ভাবে মনে-মনে—মোহন দেখা না করলেই ভালো হয়! কারণ, সে সুখী করতে পারবে না মাধবীকে আর মাধবীও চিরদিন এইভাবে কেঁদে কাটাবে। হয়তো তার সর্বনাশও হবে। কিন্তু তখন কোথায় থাকবে মোহন? হয়তো ফিরেও চাইবে না সে।

বাসায় ফিরতেই পাতানো মা সেদিন রবীনকে বললেন—হ্যাঁরে পাগ্‌লা, তুই বিয়ে করবিনে? হাসলো রবীন। জবাব দিলে—হ্যাঁ মা, বৌয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝি সকাল বেলা। কারণ, বাজারে যেয়ে ঘুরে-ঘুরে ব্যাগ্ বোঝাই করে নিয়ে আসতে আর পারিনে!

—বৌ এসে কি করবে?

—বাঃ, ওরা ব্যাগ ঝুলাতে ভারী ওস্তাদ হয়ে উঠেছে যে!

মা হাসলেন পাগলের কথা শুনে। ওর কথাগুলোই ঐ রকম। ওর মুখে যা আসে তাই বলে। ভ্যানিটীব্যাগ যেন চক্ষুশূল। হিন্দীতে যাকে বলে—ফুটানিকা বটুয়া! সেই ফুটানি ওর অসহ্যকর।

*

* *

—না মশায়, আপনার ঐ প্রেমতত্ব পড়তে আমাদের আর ভাল লাগে না! যে বই পড়ি, সেটাতেই প্রেমের কাহিনী, যেদিকে তাকাই সেদিকেই প্রেমের মাতলামি! এক সহকর্মী বন্ধু বললে রবীনকে।

হাসলো রবীন। বললে—আপনি নাকি মাসে প্রায় দশ-বারোটা সিনেমা দেখেন?

—হ্যাঁ।

—কেন দেখেন? কী দেখতে যান্ সেখানে?

দ্যাটস্ এ রিক্রিয়েশন অফ মাইণ্ড।

—ইফ সো, হোয়াই ইউ ডিজলাইক দি লাভিং! এ্যাকুচুয়ালি ইউ ডনট নো, দ্যাট লভ ইজ হেভেন্।

—তাই বলে কি সব জায়গায় প্রেম ফুটিয়ে তুলতে হবে?

রবীন বললে—প্রেম আছে বলেই সৃষ্টি, আর আমি নিজেকে ভালবাসি বলেই বাঁচতে চাই। সংসারকে ভালবাসি বলেই সংসার থেকে দূরে থাকতে পারিনে। প্রেম আমাদের অক্টোপাসের মত ঘিরে রেখেছে, তাকে এড়ানো যায় না! আজ আপনি বৌ, ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, দাস-দাসীর সাথেও যে প্রেম করছেন। তাকে আপনি মুখে এড়াতে চান্, কিন্তু আপনার অন্তর এড়াতে পারে না। প্রেম আছে বলেই সৃষ্টি। প্রেম আছে বলেই আমরা জন্মলাভ করেছি, এবং ছোট থেকে বড় হতে পেরেছি। প্রেমাকর্ষণে গড়ে উঠেছি, তাই আমাদের রক্তে লেখা আছে সে বীজমন্ত্র। নইলে

জগৎ থাকতো না, আমরাও হতাম না। আজ যদি আপনি সংসার ত্যাগ করে বনে যান, তাহলেও বলবো—আপনি শান্ত বনানীর প্রেমে পড়েছেন। যদি সেখানে যোগাভ্যাস করেন, তাও বলবো—ঈশ্বর-প্রেমে মত্ত।

বন্ধুটি নীরব রইলো।

রবীন বল্‌লে—প্রেমের কী যে অতুলনীয় স্বাদ, কী অভাবনীয় স্বাচ্ছন্দ্য, তা একটু চিন্তা করলেই অনুভব করা যায়! প্রেম হচ্ছে অমৃতরস!

টেলিফোন বেজে উঠলো।

সাড়া দিলে রবীন হ্যালো!

উত্তর এলো—হ্যালো। কে, রবীনবাবু?

—হ্যাঁ। নমস্কার।

—নমস্কার। কালকে দেখা হয়নি। চারটে থেকে সাড়ে চারটে অবধি দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। বললে মাধবী।

—ভালকথা, কাল উনি শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরেছেন ঠিক পাঁচটায়। এসেই আমার পত্র পেয়ে সাড়ে পাঁচটায় এসপ্লানেডে এসেছিলেন, সেখান থেকে আমার এখানে। আপনিও পোষ্টকার্ডে তাঁকে নাকি পত্র দিয়েছেন বন্ধু সেজে। তাঁর স্ত্রী একটু সন্দেহ করেছেন, লেখার ভঙ্গীতে। আর, যে জামা-কাপড় পাঠিয়েছিলেন তা পেয়েছেন।

—আপনাকে যা কিছু বলতে বলেছিলাম, সব বলেছেন?

—হ্যাঁ, বলেছি। দেখা করবেন। তবে দিন স্থির করেননি, পরে জানাবেন। মোট কথা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখা হবেই।

—হ্যাঁ, হবে। পরজন্মে দেখা করবে, মাধবী বলে।

—কেন?

—সে আমি জানি, ওর রীতি! তাছাড়া আর কিছু বলেছে?

—না, আর কিছু না।

বলেছিল বৈকি। বলতে নিষেধ করেছে রীবনকে। সে আর

দেখাই করবে না। তার নাকি আর ভাল লাগে না। অসহ্য লাগছে সব। বড্ড বাড়াবাড়ি করে নাকি মাধবী।

রবীন মোহনকে সন্ধ্যায় এসে বলেছিল—ও যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, বুঝিয়ে বলবেন যে, সে পরে দেখা করবে। সে অবিশ্বাস করবে জানি। আর সেই সাথে যতদূর বিশ্বাস আপনাকে সাথে নিয়ে হাজির হবে আমার দরজায়। খবরদার! কোন প্রকারে সে যেন যেতে না পারে সেখানে। তাহলে একটা কেলেঙ্কারী হবার সম্ভাবনা বেশী। সে হয়তো সব কিছু বলে দিতে পারে সবাইকে। তখন আমিও রেগে একটা কিছু করে ফেলতে পারি। যেমন করে পারেন ওকে বুঝিয়ে রাখবেন। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনাকেই নিতে হবে। পাগলা কুকুরের মত ও এখন জ্ঞানহারা।

রবীন তাকে ভরসা দিয়েছিল—যেমন করে পারি নিরস্ত করবো।

মোহন যে মিথ্যাবাদী একথা মাধবী অনেকবার প্রমাণ করিয়ে দিয়েছিল। মোহন তাকে পত্রে জানিয়েছিল যে, সে দু'মাসের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। রবীনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলেছিল—পনেরো দিনের ছুটি।

মাধবী বলে—দেখুন, এই জন্য ওকে আমি আজকাল বিশ্বাস করিনা, ওর কথার কোন মূল্য নাই। আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, আপনিই আমার সব কিছু ভরসা।

রবীনের অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় মাধবী ফোনে রবীনকে বলেছিল—এখনি আপনার বন্ধুকে অমুক জায়গায় আমার সাথে দেখা করতে বলুন।

মোহন গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগারাগি করে চলে এলো। সেদিন দেখতে এসেছিল মাধবীকে। তাই পালিয়েছিল। বাড়ীতে ফিরতে চায় না। মোহন ও তার সাথে পথে ওভাবে ঘুরতে সাহস পায় না। তাই যখনই ছেড়ে চলে আসে মাধবীও পিছু ছুটে আসে কাঁদতে কাঁদতে মোহন ফিরে যেয়ে আবার যেতে বলে। তবু সে যায় না। তখন তার প্রিয়তম রেগে কী যেন বলছিল। রাস্তার

লোক জনও দেখেছিল সে দৃশ্য। শেষে অনেক বুঝিয়ে বলে তাকে বাসার সামনে নিশ্চুপে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতেই পেছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ভীত হলো সে। দেখলো মাধবী কাঁদছে। বলছে—মোহন, তুমি কী নিষ্ঠুর! তোমার বুকে দয়া নেই, মায়া নেই, প্রেম নেই! তুমি পাষাণ—তুমি পাষণ! আমার যে কী অবস্থা, তা তুমি বুঝবে না মোহন। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বাড়ী ফিরলে শাস্তি পেতে হবে, তার চেয়ে গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়ে মরাই ভাল।

সত্যিই সে ছুটে গিয়েছিল গঙ্গার দিকে! মোহন তাকে নিরস্ত করে অনেক বকাবকি করে পাঠিয়েছিল। বলেছিল—যদি তুমি আমাকে অপমান বা জব্দ করতে চাও এই লোকালয়ের ভেতরে, তাহলে বলো এর ব্যবস্থা করি। তাহলে আমায় আর পাবে না!

মাধবী কাঁদতে-কাঁদতে ফিরেছিল বাসায়। মোহনের সেদিন এমনিভাবে রাত ন'টা বেজে গিয়েছিল। এসে বললে সব রবীনকে। জিজ্ঞাসা করলে—মাধবীর বাড়াবাড়ি ভাল হয়েছে কিনা? রবীন তখন মোহনকে সমর্থন করেছিল! এই সমর্থনের কথাটা মাধবীর কাছে বলেছিল মোহন তাই সেদিন রেষ্টুরেণ্টে বসে জিজ্ঞাসা করেছিল রবীনকে—কথাটা কি সত্য?

সেদিন নানা ভঙ্গীমায় ও উপমায় অস্বীকার করেছিল রবীন। মোহন যে মিথ্যা কথা বলে মাধবী আর একবার তা প্রমাণ করলো। রবীন নীরব রইলো কথা শুনে।

মাধবীর অনুরোধে রবীন আজ চারটের সময় গিয়েছিল এস্‌প্লানেডে নির্দিষ্ট জায়গায়। তাকে সাথে নিয়ে গেল বাসষ্টাণ্ডের কাছে।

চমকে ওঠে রবীন। বলে—কোথায় যাবেন?

—বাসে চড়ুন তো, তারপর যেখানে নাবতে বলি, সেখানে, নেবে পড়বেন।

—কেন, ওঁর বাসায় যাবেন কি?

—হ্যাঁ।

—অসম্ভব। একটা বিরাট কেলেঙ্কারী সৃষ্টি হবে। আর আমাকে বলবে—তুমিই সাথে নিয়ে এসেছো। খুব রেগে যাবে।

—আমি সেখানে কাউকেই কিছু বলবো না। শুধু দেখবো সে কী করে। আমি প্রথমে কথা বলবো না। দেখবেন সেই আগে কথা বলবে। আপনি শুধু সাথে থাকবেন।

রবীন বললে—একটু দাঁড়ান। অবস্থাটা ভাল করে বিচার করুন। মোহনবাবু অত্যন্ত বদরাগী মানুষ, কেলেঙ্কারী সৃষ্টি না করে বসে। আমার অত্যন্ত ভয় করে। তাই যেতে আপনাকে নিষেধ করেছি।

মাধবী হাসলো। একটি বাস চলে গেল। সে বললে—আপনি বলবেন—আমার কোন দোষ নাই, সে আমাকে এস্প্লানেডে দেখতে পেয়ে জোর করে সাথে নিয়ে এলো।

রবীন লক্ষ্য করলো তার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হবে। সে যাবেই। তার সাথে চড়তে হলো বাসে।

বসলো মাধবী। স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে রইলো রবীন। ভাবছিল আজ কী যেন একটা কেলেঙ্কারী হয় তারই সাক্ষাতে। জামাতে টান্ পড়তেই চেয়ে দেখলে মাধবী ডাকছে।

মাধবী বললে—আমার পাশে বসুন না!

রবীন বসে পড়লো পাশে। টিকিট কাটলো রবীন।

হাসছিল মাধবী কি ভাবছিল তা সেই জানে।

রবীন বললে—আপনি তো খুব হাসছেন, আর আমার ভয় হচ্চে।

—নাঃ, আপনি নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনার এত ভয় কেন?

—ভরসাও যেন করতে পারি না। আপনি নিশ্চয়ই জট পাকাবেন। মেয়েদের স্বার্থের একটু হানি হলে তারা হয়ে ওঠে বেপরোয়া! তখন তাদের কাণ্ডজ্ঞান সব লোপ পেযে যায়!

আপনি দেখছি সবজান্তা মশায়!

বাস্ থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নেবে পড়লো দু'জনে। হাঁটলো পথ বেয়ে। অনেকখানি যেতে হবে।

রবীন বিনয়যোগে বলে—আমার একান্ত প্রার্থনা, কোন কিছু গণ্ডগোল পাকাবেন না সেখানে যেয়ে।

—আপনাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে!

—কি কাজ? প্রশ্ন করে রবীন।

—আমি তার মায়ের সাথে গল্প জুড়ে দেবো। আপনি আমায় বলবেন—আজ একখানা গান গেয়ে শুনান! তখন আমি একখানা গান গাইবো, যা শুনে ওর খুব রাগ হবে! আর ওর মাও বৌদের চিন্তানদীতে জাগবে তুফান্।

—একথা বলতে গেলেই মোহনবাবু আমাকে অবিশ্বাস করবে, আর বল্‌বে যে, এ সবের মুলে আছে রবীন নিজে?

—না-না, তা হবে কেন! গান গাইতে বলাও কি দোষ?

—নিশ্চয়ই! যদি তার অর্থ হয় প্রকাণ্ড!

রাস্তার ছ'পাশে গাছপালা আর ছোট বড় বাড়ী। দু'জনে হেঁটে চলেছে। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি যেতেই মাধবী আগে চললো।

রবীন তাকে আর একবার হুঁসিয়ার করে দিলে।

মাধবী বললে—শুয়ে আছে মনে হচ্ছে।

বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করতেই মোহনের মা সারদাদেবী হাসি মুখে এগিয়ে এলেন।

বললেন—এতদিন পরে মনে পড়েছে! এসো, এসো!

মোহন তক্তপোষে শুয়ে রইলো নীরবে। মুখে আজ কথা নাই। চোখ দুটো মুহূর্তে যেন লাল হয়ে গেল। কট মটিয়ে চাইলো রবীনের দিকে।

বেচারা নিরুপায়। মোহন বুঝি ভুল বুঝলো। তাই সে একখানি কাগজে লিখে দেখালো সংক্ষিপ্ত বিবরণটা। মোহন পড়লো উত্তর দিল না।

মাধবী মোহনের দিকে পেছন ফিরে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছে তাঁদের সাথে। সংসারের কথা, কলেজের কথা এমনি ধারা অনেক।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। মোহন উঠলো। জামাটা গায়ে দিয়ে বের হলো। ফিরে এলো কিছু খাবার নিয়ে।

চা এবং জল খাবার দিয়ে গেলেন মাসীমা। মাধবী বললে—আমি খেয়ে এসেছি, খাওয়া অসম্ভব হবে। আর চা কখনো খাইনে।

—না-না, খাবারটা খেতেই হবে! সারদাদেবী বললেন।

কথা রক্ষার্থে কিছুক্ষণ পরে সামান্য একটু মুখে তুলে দিলে। রবীন সবই খেলো নির্বিবাদে।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অথচ মাধবী আর মোহনের সাথে কথা হয় না। কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহের ছায়া পড়েনি, একথা ভাবা যায় না। কারণ যাদের নিয়ে সম্পর্ক, তারাই নীরব! ব্যাপার কি!

—যাবেন না? মাধবী বললে রবীনকে ধাক্কা দিয়ে।

—চলুন।

মাধবী প্রণাম পর্ব সেরে এলো। পিছু-পিছু এলো মোহন চরম বিস্মিত রবীন।

পথ বেয়ে চলেছে তিনজন। কারো মুখে কথা নেই। মোহন আগে বললে—কি, তুমি এলে কেন আবার?

—অর্থাৎ। গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় মাধবী।

—কেন চিঠিতে কি লিখেছিলাম?

—তোমার লেখার বা কথার কোন মূল্য নাই জানি। তুমি যা খুশী তাই করতে পারো। তুমি স্বার্থের জন্য মানুষের গলায় ছুড়ী চালাতে পারো। মনুষ্যাধম তুমি। ভেবেছো বুঝি—এই লিখ্‌লে সে আর আসবে না। আমার সাথে তুমি খেলা আরম্ভ করেছো। তবে আমি কারো কোন ক্ষতি করতে চাইনে—এই ভেবেই নিশ্চিন্ত থেকো।

—আমি যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি। তার জন্য তোমার বা আর কারো পরামর্শ নিতে ইচ্ছুক নই। মোহন বললে।

—বলতে লজ্জা করলো না তোমার। এ বুদ্ধি আগে হয়নি কেন। কেন তুমি খুঁচিয়ে ঘর্ থেকে বের্ করে আনলে আমাকে? সে কি এমনি ভাবে আমার সর্বনাশ করতে?

—ও সব আমাকে শিখিয়ো না। তোমার এটুকু বলতে লজ্জা পাওয়া উচিৎ ছিল না যে, মেয়েদের ইচ্ছা না থাকলে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তোমাকে ক্লোরোফর্ম করাও হয়নি।

—হ্যাঁ, জানি, পুরুষেরা ভুলিয়ে তাদের বের্ করে, পড়ে ছেড়ে দেয় সাধ মিটিয়ে। বললে মাধবী।

—ও কথা বললে শুনবো না, তুমি তখন নাবালিকা ছিলে না। তোমরা বিপদে পড়লে এমনি ভাবে দোষ স্খালন করো জানি। নারী জাতিকে চেনা দুঃসাধ্য। তারা সব পারে।

—আর এ কথাও ঠিক—মুসলমানের মুরগী পোষা আর পুরুষ-জাতির ভালবাসা সমান। মিথ্যা কথা বলতে তোমাদের মুখে এতটুকু বাধে না। পুরানো বুলি আওড়ায় মাধবী।

হঠাৎ রবীন কী যেন বলতে চেষ্টা করলো। থেমে গেল। উত্তর দেওয়া এখন যুক্তিসঙ্গত হবে না। তাহলে মাধবী হেরে যাবে। সে বলতে চেয়েছিল তার ঘটনাটি।

মাধবী বললে—ভাল কথা, আপনি সেদিন আমাদের ঘটনাটি শুনে আমাকে দোষী করেছিলেন কি?

রবীন মুহূর্তে মোহনের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে একটু হেসে বললে—বাদ দিন ওসব কথা।

—না, বাদ দেবো না? সামনা-সামনি প্রমাণ করবো।

—বেশ রবীনবাবু না বলুক, আমিই বলেছি। অন্যায় হয়েছে কিছু?

মাধবী এবার রেগে উঠলো। তুমি মিথ্যাবাদী। আমি রবীন-বাবুকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধাকরি তুমি সেটুকু হারিয়ে দিতে চাও মিথ্যা কথা বলে। কেন জবাব দাও?

রবীন দেখলে রাস্তার মাঝে এমন তর্ক হওয়া উচিৎ নয়। একটু দূরেই কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে শুনছে। তাই তাদের দুজনকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। একে একে বাস্ অনেকগুলো চলে গেল আপন পথে।

—শোন মাধবী, তুমি বুঝবেনা এখনও। পরে বুঝবে যে তোমার ভালর জন্যই আমি এমন করছি।

মাধবীর কণ্ঠস্বর আরো চড়ে গেল। বললে—ভালর জন্য! তুমি সবই আমার ভালর জন্য করছো! দু'হাতে মাথার চুল সরিয়ে বললে—এই যে মাথায় সিঁদুর এও কি আমার ভালর জন্য! তুমি আমায় নিয়ে কিনা করেছো। মনে আছে বলেছিলে একদিন—তুমি আমার বউ, তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করবো না।

—সব সময় সব কথারই মূল্য ধরতে হবে! কবে কখন কি বলেছিলাম, আজ তাই মেনে চল্‌তে হবে!

—সেকি কথা! শুনুন রবীনবাবু।

রবীন মাথা নীচু করে রইলো। আর সহ্য করতে পারলো না। বললে—যে কথার কোন মূল্য রাখতে পারবেন না, সে কথা বলেন কেন! ছিঃ, গুরুতর অন্যায় করেছেন! এভাবে খেলা করা উচিৎ হয়নি মোটেই।

মাধবী বললে—শুনলেন তো? যার কথার কোন মূল্য নেই, তাকে কোন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সে সব কিছু করতে পারে। এখানেই প্রমাণ হলো যে, সে নিজেকেই বিশ্বাস করে না। প্রয়োজন বোধে সে সব কিছু বলতে ও করতে পারে!

যাক্, শেষ কথা, তোমার সাথে আর আমি কথা বলতে চাই না! আমি যা লিখেছি, তা যদি মানতে পারো, তবেই তুমি আমার সাথে মিশতে পাবে, নইলে জীবনের মত শেষ!

তুমি লিখেছো বিয়ে করতে! কিন্তু মনে রেখো—আমি নিবেদিতা। ইচ্ছে হয় লাথি মার তবু আমি তোমার পা ছাড়বো না। ইচ্ছে হয় যথেচ্ছাচার করো, কিন্তু তোমার সঙ্গ ছাড়বো না। বিষ খাইয়ে দিও, আমি মরবো। কেঁদে ফেললো মাধবী।

—ওসব ন্যাকামী ছেড়ে দাও! বললে মোহন।

মাধবী সে কথায় কর্ণপাত না করে বলে চললো—তুমি আমার সব! জীবনের সাধ তুমি, ভরসা তুমি, তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে

পারবো না। তোমাকে আমি সেদিন বলেছি—এক সাধু আমার হাত দেখে বলেছে যে, এ মেয়ে অল্প বয়সেই মারা যাবে।

মোহন বাধা দিলে—বাদ দাও! ওসব সাধুদের আমি বিশ্বাস করিনে।

গম্ভীর হলো মাধবী। বললে—ও, বুঝতে পেরেছি! আমার বেলায় ওসব বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তোমার বৌয়ের হাত দেখে নাকি এক সাধু বলেছিল—এ মেয়ে লক্ষ্মী! মহাভাগ্যবতী! এর স্পর্শে ঘর আলোকিত হবে! সেকথাটি চৌদ্দবার হেসে-হেসে আমাকে বলেছিলে। সে বুঝি তোমার বউ! তাই সে কথাটা সত্যি। সে নারী বুঝি উত্তমা, আমি বুঝি অধমা! সেই সাধুই খাঁটি সাধু, আমার সাধু নকল। তার কথা সব সত্যি, আমার কথা মিছে, তাই না? উত্তর দাও। গর্জ্জে ওঠে পাগলিনীর মত। রবীন দেখতে পেলো মাধবী রাগে-দুঃখে-ব্যথায় যেন কাঁপছে। চোখ দুটো জলে পরিপূর্ণ।

—ওসব বাজে কথা বন্ধ করো। রাত হয়ে এলো, বাড়ী যাও। বিয়ে করে আমার সাথে মিশো, তার আগে নয়!

—আবার সেই কথা বলছো মোহন! রবীনবাবু, যদি আপনাকে আমি বলি—আজ থেকে আপনি আমার স্বামী! তাহ'লে আপনি আমাকে কি অবিশ্বাস করবেন, মূল্য দেবেন না, আমার কথার। এগিয়ে যাবেন না কি আমার কথার উপর আস্থা রেখে।

—বিশ্বাস করবোই! বলে রবীন।

মোহন বললে—সব দিকে বিবেচনা করে বলুন রবীনবাবু।

—হয়েছে! উনি সব বুঝেছে! কিন্তু তুমি যখন আমাকে এতবড় আঘাত দিতে পারলে, তাহলে তুমিই দাও একটা পাত্র ঠিক করে। কারণ, আজ পাঁচ বছর থেকে আমি মনে-প্রাণে তোমাকেই স্বামী বলে মেনে নিয়েছি। তুমি নিজে উৎসর্গ করো অন্য হাতে—যদি তাতে তোমার বিবেচনায় না বাধে!

—না, আমার দ্বারা ত সম্ভব হবে না! তোমার মা-বাবাই ঠিক করে দেবেন।

—বল্‌তে পারো মোহন, যার সাথে আমার বিয়ে হবে, তাকে দেবার মত আমার কিছু আছে, না—রেখেছো?

মোহন নিরুত্তর। রবীনের শিরায়-শিরায় আগুন খেলে গেল। মাধবী বলে কি! তাহলে বন্ধুদের কথাগুলো সব সত্যি। এ শুধু প্রেম নয়। তাহলে মাঝে-মাঝে সে যা ভাব্‌তো, তা ঠিক?

একটু পরেই মোহন বললে—তুমি বকর্‌-বকর্‌ করো, আমি চললাম।

পা বাড়াচ্ছিল মোহন। থেমে পড়লো মাধবীর কথায়।

মাধবী বল্‌লে—না আজ অত সহজে তোমায় ছেড়ে দিতে আসিনি। আমার সাথে যেতে হবে তোমাকে।

—এত রাতে তোমার সাথে কোথায় যাবো? আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। বাড়ীতে কিছু বলে আসিনি। তাই আজ আমি চলে যাচ্ছি। নইলে সবাই চিন্তা করবে। তুমি বাড়ী যাও।

—আমি জানি, তাতে তোমার তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। ঐ বাস আসছে, উঠে পড়ো। মাধবী এই কথা ক'টি বলে রবীনের দিকে চেয়ে ইসারা করলো তাকে সাহায্য করতে।

রবীনের প্রাণ আগেই গলে গেছে। সুতরাং সে বললে—চলুন না মোহনবাবু একটু সাথে যাবেন, আবার চলে আসবেন। অভিনয়ের পরিণতি দেখতে সে উৎগ্রীব। তাই প্রেরণা দান।

অনেক বলে মোহনকে সাথে নিয়ে হাজির হলো এস্‌প্লানেডে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। লোক-জনের ভিড় কমে এসেছে। কমে এসেছে যান-বাহনের চলাচল।

মাধবী রবীনকে লাইট্‌পোষ্টের নীচে দাঁড়াতে দেখে বললে—আপনি কষ্ট করবেন কেন আর, চলে যান।

মোহন ছাড়লো না। বললে—না, উনি এখানে একটু না দাঁড়ালে তোমার সাথে যেতে সাহস পাইনে। সুতরাং রবীনবাবুকে কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতেই হবে। দেখি তোমার কী উদ্দেশ্য আছে, চলো।

তারাভরা রাতে রবীন দাঁড়িয়ে রইলো আকাশের দিকে চেয়ে। মোহনকে নিয়ে মাধবী চলে গেল মনুমেন্টের দিকে। একটি মেয়ে ভ্যানটিব্যাগ ঝুলিয়ে রবীনের পাশ দিয়ে ঘোরা-ফেরা করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝলো, সে কেন ঘুরছে। কি তার উদ্দেশ্য তাও জানে। মেয়েটির চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, পরণে ভালো দামী শাড়ী, গায়ে গওনা। কে বলবে যে, সে একজন পতিতা। বিচিত্র এই মহানগরী। কেউ কাউকে দেখে বল্‌তে পারে না যে, এ কোন্ জাতি, কোন্ দেশীয়, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, গরীব কি ধনী। আভিজাত্যের পর্দ্দা ঝুলিয়ে এখানে সবাই চলে। একবেলা অন্ন না জুট্‌লেও স্নো, লিপষ্টিক সেণ্ট চাই বাইরে বেরাতে হলে। দরকার দামী জামা-কাপড়, চশমা, ভালো জুতো, ভ্যানিটিব্যাগ। দেখা গেছে—হয়তো তাদের অনেকেরই দু'বেলা দু'মুঠো খাবার সংস্থান নেই, থাকে বস্তীর ভাঙ্গা ঘরে। মাসে আয় মাত্র ষাট কি সত্তর।

এখানকার সবাই যেন ধনী। কেউ কারো থেকে ছোট হতে চায় না। সবাই সবাইকে হাম্‌বড়া ভাব দেখাতে চায়। তারা যে অনেক উচ্চস্তরের, এটাই পোষাক-পরিচ্ছদে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ভগবান কেন এই লোকগুলোর দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন না বুঝতে পারে না রবিন। নাইলে তাদের ধ্বংস যে অনিবার্য।

আজ এদেরই দয়ায় এখানকার ব্যবসায়ীরা প্রাসাদ গড়ছে, অন্নহীন-বড়লোকদের দল মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বুড়ো-বুড়ির দলও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার টানে, অথবা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীর চাপে দু'বেলা স্নো-পাউডার মেখে চৌদ্দবার আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছেন। লক্ষ্য করছেন কোথাও গল্‌তি হলো নাকি! লোকে খারাপ বল্‌বে নাতো! কুশ্রী হতে হবে নাতো! এঁরা মনে-প্রাণে কোন্ শ্রেণীর? যিনি বিগত যৌবনা তাঁর আবার রূপের প্রয়োজন কোথায়?

আজ এই মুহূর্তে আর একটা কথা মনে পড়ে। একটি বিশ্বাসী লোক তাকে বলেছিল, সে নাকি একদিন রাতে এই মনুমেণ্টের সামনে বাস থেকে নেবেছিল। অদূরে এক মেয়ে ট্রাম থেকে নেবে ওর দিকে চাইতেই ছেলেটী বুঝতে পেরেছিল যে, সে কোন শ্রেণীর মেয়ে। ইসারা দিতেই কাছে এলো। দু'জনে গিয়ে বসেছিল মনুমেণ্টের পেছনে। একটু গল্পগুজব হবার পর ছেলেটিকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল নিকটের নামকরা খাবারের দোকানে।

খেয়ে আসতে রাত ন'টা বাজলো। মেয়েটি বলেছিল যে, সে আর এক মুহূর্তে থাকতে পারবে না। বন্ধুর বাড়ী যাবার নাম করে বের হয়েছিল সে। পিতার আদেশ রাত নটার ভেতর ফিরতে হবে। তাই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল সাধ মিটিয়ে। পরের দিন আসতে অনুরোধ করেছিল ছেলেটিকে। মেয়েটার নাম ছিল চম্পা। ছেলেটি পরদিন আর যায়নি।

রবীন ভাবে, বিধাতার হাতে গড়া এই নর-নারী। অথচ বিধাতাই চিনতে পারে না এদের, বারবার ভুল করে বসে। এমনি রহস্যময় এই মানবজাতি, আর রহস্যময়ী পৃথিবী। একটা কবিতা তার মনে এলো—চঞ্চলা চন্দনা চন্দনে চর্চ্চিত,

অঞ্চল অঙ্গনে অঞ্জন অর্চ্চিত,
উত্থিত উদ্ধত উরসিজ উর্ব্বসী,
মন্মথ-মত্ততা মলিষ্ঠা মোর শশী!

বীণার সাথে রবীনের আবার দেখা হয়েছিল আকস্মিক ভাবেই। সেদিন দুপুরে রবীন গিয়েছিল তার বন্ধুর বাসায়। রেলিংএর পাশে চেয়ারে বসতেই একটা বাচ্চা মেয়ে এসে বলছে—মামা, বীণা মাছী এছেচে। আধস্বরে বলে।

কে বললে?

তুমি আমাল কতা বিচ্ছাস কলো না? বলেই ডেকে বসে তার মাকে—মাগো—মা, বীণা মাচী এছেচে, মামা বিচ্ছাস কলে না?

সবার মুখে রবীন আর বীণার কথা শুনতে শুনতে তার শিশু মনটাও ধরে নিয়েছে যে, বীণা মাসী রবীন মামার কেউ হয় নিশ্চয়! তাই সে সর্ব্বপ্রথমে ছুটে এসেছে সংবাদ দিতে।

তার মায়ের সাড়া পাবার আগেই বেরিয়ে এলো বীণা। রবীন বই পড়ছিল। বইয়ের উপর থেকে মুখ তুলে চাইলো না সেদিকে। পাশে দাঁড়ালো বীণা। তবু ফিরে চায় না রবীন।

শেষে গায়ের সাথে গা লাগিয়ে বললে—অভিমান ভাঙ্গবে না? না—আমার সাথে কথা বলা দোষ!

হাসিতে রবীনের পেট গুলিয়ে উঠছে। চাপতে বহু চেষ্টা করেও পারে না। মাথা নীচু করে মুখ টিপেই হাসে।

একটু পরেই মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—আজকাল শরীর কেমন আছে? চেহারা তো এখন খারাপ দেখতে পাচ্ছি।

প্রয়োজন নেই, যাও।

এখনও আমায় ক্ষমা করতে পারেননি?

তুমি তো কোন অপরাধ করোনি, যে—ক্ষমা করবো।

অন্যায় করেছিলাম তো। বীণার কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে আসে।

বলে—আপনাকে কাঁদিয়ে আমিও খুব সুখে নেই।

আমি তো কোন অভিশাপ দিইনি। বলে রবীন।

দিলে হয়তো ভাল করতেন।

রবীন চুপ করে থাকে। বললে—কবে এলে?

—এ—ই দশ মিনিট হলো।

—আর—আমিও এই মুহূর্তে—

বীণা হেসে বললে—তার হয়তো না করতে পারি, কিন্তু অন্তরের তারের ডাক যে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ, একথা মানেন তো? এসেই আপনাকে স্মরণ করেছি—এলে একবার তু'চোখে দেখতে পেতাম।

তাই বুঝি হাওড়া ষ্টেশনে যেয়েও ফিরে আসতে হলো এদিকে। ভেবেছিলাম—একটু বাইরে যাবো।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বললে—বিশেষ ক্ষতি হলো কি?

—না, লাভ হয়েছে! আমিও একটু—কথা চেপে যায় ব্যথিত রবীন।

কি ?

—কিছু না !

—আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন ?

বীণার মুখের দিকে দুচোখ মেলে তাকায় রবীন। বললে—কি করে জানলে ?

—বুঝতে পারি !

—আমার মনের কথা তুমি সব বুঝতে পারো ?—কেন ?

—বুঝবার ক্ষমতা আছে বলেই !—আচ্ছা, আপনার শরীর নাকি কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল শোকে-দুঃখে ? দিনরাত নাকি না খেয়ে না ঘুমিয়ে থাকতেন, কেন ?

—প্রায়শ্চিত্ত করবো না ? না—সেটাও করতে না করো ?

দুঃখের হাসি হাসে বীণা। বলে—ঐ প্রায়শ্চিত্ত আমার উপর পড়েছিল, তাইতো আমার—

রবীন বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে থাকে। বললে—তোমার কি হয়েছে, বীণা ? কোন ক্ষতি করেছি ?

—নাঃ ; বলতেই তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—আপনার দুঃখ, অশ্রু যেয়ে আমাকে পুড়িয়েছে।

আচ্ছা, এখন থেকে আর আমি কাঁদবো না !—একবার শুধু প্রাণভরে তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম। দেখা পেলে হয়তো কাঁদতাম না ! আজ আমার সব দুঃখ, সব আশা-সাধ মিটে গেছে। বাদল শেষের তরুলতার মত এখন আমি শান্ত-স্নিগ্ধ আর আনন্দ বিহ্বল হয়ে চলবো। এখন যাই তবে ?

না, এখন নয় ! একসাথে চলে যাবো এখান থেকে।

—কোথায় চলে যাবে ?

—ঘণ্টাখানেক বাদেই রওনা দিতে হবে বালিগঞ্জে খুড়শ্বশুরের বাসায়। সেখানে থেকে যাবো অন্য জায়গায়।

একটু পরেই তার দিদি মীণা এলো। বললে—ঠাকুরপো, মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন তো ?

—অপরাধ ?

বৌদি বললে বোনকে—বীণা, তোর মুখ নেই ? না—লজ্জা করে চাইতে ?—আমি অনেক চেয়েও পাইনি।

—দিদি, তুমি যাওতো এখান থেকে !

—বেশ, চলেই যাচ্ছি ! হাসতে হাসতে বিদায় নিল মীনা দেবী।

বীণা রবীনের হাতখানা হাতের ভিতর নিয়ে বললে—আমাদের বিয়ে হোক, এ হয়তো ভগবানের ইচ্ছা ছিল না, কিম্বা হয়তো তাতে আপনার ক্ষতি হতো, তাই হলো না। নইলে আপনি প্রথমেই রাজী হয়ে যেতেন বিয়ে করতে।

—সে সব কথা বাদ দাও, বীণা।

বীণা চুপ করলো। 'তারপর বললে—যখন বিয়ে করবেন আমায় জানাবেন তো ?

রবীন হাসে ! বলে—আমি বিয়ে করবো না।

—ততদিন আমিও শান্তি পাবো না।

—কেন ?

জানি না।—আমার কাতর মিনতি রইলো, আপনাকে বিয়ে করতে হবে, এবং তার আগে আমাকে জানাতে হবে।

রবীন একটু হেসে বলে—না জানালে ?

—আমার দুঃখের সীমা থাকবে না ! যদি মেয়েছেলে হতেন, তাহলে বুঝতেন।

রবীন বললে—তুমি এখান থেকে সরে যাও, অন্যান্য সবাই কি ভাববে শেষে।

—যার যা ভাববার ভাবুক ! তা ছাড়া আপনাকে সবাই চেনে এবং জানে ? পাষাণকে সবাই চিনতে পারে।

সেখানে এলো রবীনের বন্ধু। বললে—চলুন, সিনেমায় যাই।

—না, সিনেমায় যাবে না। বীণা বললে।

—কেন ?

—আমার সাথে একটু পরেই যাবে !

—কোথায় ?

—যেখানে দুচোখ যায়—সেখানে !

বন্ধুটি হাসলো। বললে—আমাদের দাবীর চেয়ে তোমার দাবী বড্ড জোর দেখতে পাচ্ছি !

—স্বাভাবিক !

—বেশ। চলে গেল বন্ধু। যাবার সময় মুচকি হেসে বলে গেল—আবার ফ্যাসাদে ফেলো না রবীনবাবুকে।

শুনে হাসলো। বীণা বললে—আপনার ঠিকানাটা আমায় দিতে হবে।

—কেন ?

—প্রয়োজন আছে।

—না, বীণা, তা সম্ভব নয়।

—আমি চিঠি লিখবো প্রয়োজন হলে।

রবীন বললে—আমি তা জানি, আর জানি বলেই দিতে পারি না।

—অপরাধ ?

—তাতে হয়তো তোমার ক্ষতি হতে পারে। আমি তা হতে দেবো না, বীণা।

বীণা একটু মৌন থেকে বললে—আপনার বন্ধুর কাছ থেকে জেনে নেবো !

—আশা করি সেও দেবে না। তাছাড়া মনে রেখো, ভালোবাসা মনের খাতায় লেখা থাকে, সেটা কাগজে লিখে আরম্বর স্মৃষ্টি করে লোকচক্ষুতে ধরা পরে কলঙ্কিনী হওয়া হবে সম্পূর্ণ অনুচিত ! আর—
—সেটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। সে সুযোগ দিতে আমি অনিচ্ছুক।

বীণা গম্ভীর হলো। বললে—তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চান না ?

যোগাযোগ অন্তরের, বাইরের নয়। যদি কখনো এখানে এসে

আজকের মত এমনি স্মরণ করো, তাহলেই আমি ছুটে আসতে বাধ্য হবো? তাই বলে যোগাযোগের নামে দুর্যোগ বা অভিযোগ করে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারিনে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল বীণা। তারপর ফিরে এলো এক কাপ চা নিয়ে। রবীনের হাতে তুলে দিয়ে চেয়ে থাকে মুখের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে। বললে, আজ অনেক দুঃখের ভেতরও আনন্দ পাচ্ছি। যেতে ইচ্ছে করছে না আপনাকে ছেড়ে। চিরদিন যদি দু'জনে একপথে চলতে পারতাম থাকতাম পাশাপাশি কত ভাল হতো।

সেদিন রাতে মোহন আর মাধবী যখন ফিরলো, তখন রাত সোওয়া ন'টা। রবীন দাঁড়িয়েই ছিল এতক্ষণ। ভয় হচ্ছিল—খারাপ কিছু ঘটলো না তো! আজকাল তার শুধুই ভয়—কবে বুঝি দুঃখে আত্মহত্যা করে বসে এই ভাগ্যহীনা মাধবী! কবে যেন শুনতে হবে—মাধবী ইহজগতে নেই।

মাধবী এলো মোহনের পিছনে! প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির অব্যবহিত পরেই কুঞ্জের যে রূপ দাঁড়ায়, মাধবী ঠিক তাই। নিস্তব্ধ, নিঃসাড়, ভেজা ভেজা মুখ-চোখ!

রবীন বললে—মনের কথা বলা হয়েছে তো?

—উনি আমাকে মনুমেণ্টে চড়াতে চেয়েছিলেন! মোহন বললে। কথায় যেন ব্যাঙ্গোক্তি ফুটে ওঠে।

—তার মানে? রাতে তো মনুমেণ্টে চড়া যায় না। রবীন কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে।

—বড় সাধ ছিল মনুমেণ্টে চড়িয়ে ফেলে দিয়ে আশাপূর্ণ করবেন। কিন্তু তা হলো না! আমি হুঁসিয়ার ছিলাম! পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তাঁকেই!

মাধবীর মাথা অবনত! মুখখানি ভার!

—আমার শেষ কথা বলে দিয়েছি! আপনারা এবার বাসে চেপে পড়ুন। আমি চললাম।

রবীনের কেমন যেন সন্দেহ হলো। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে!

একই বাসে দু'জনে চেপে বসলো। মোহন অন্য বাসে উঠে চলে গেল।

রবীন মাধবীর পাশেই আসন গ্রহণ করলো তার নির্দেশ।

রবীনবাবু, আজ আমার সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করেছে! আমার সহ্য হয় না। এক একবার মনে হয় বিষ খেয়ে এ ব্যথার হাত থেকে নিস্তার লাভ করি! দিনের পর দিন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। আপনার কাছে উপদেশ চাই।

চট করে অনেক কিছু ভেবে নিলে রবীন। সময়োপযোগী উত্তর দেবে সে। তাতে উভয় পক্ষের মঙ্গল। বললে—সত্যি, কুকুরের মতই ব্যবহার করছেন! আমার মতে এভাবে তার দরজায় ধর্ণা দেওয়া দুর্বলতারই লক্ষ্মণ! উনিও এই সুযোগে আপনাকে ঘা দিচ্ছেন। আপনি আর দেখা করতে যাবেন না। তাঁকে একবার এমনি ধারা আপনার দরজায় আসবার অবকাশ দিন! আপনাকে রীতিমত ঘৃণা করছেন ঐ মোহনবাবু! তাঁর চেয়ে আপনি কম কিসে। কেন যাবেন তাঁকে বারংবার সাধ্য-সাধনা করতে। তাঁকে একদম ভুলে যেতে চেষ্টা করুন। উনি মানুষ নন, পশু। আবার যাবেন, আবার ভীষণ ঘা খাবেন! এর চেয়ে ঘৃণার আর কিছুই নাই! তিনি আপনাকে একটুও ভালবাসেন না, যদি ভালই বাসতেন তাহলে এভাবে আপনার সনর্বাশ করতে পারতেন না।

—"সেই এক কথা—বিয়ে করে তারপর আসবে আমার সাথে দেখা করতে! বলুন, এ কেউ বল্‌তে পারে!

তিনি সব পারেন! তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। কার সাথে আপনি প্রেম করতে গেছেন? সে কি মানুষ? তাই আমার শেষ

কথা—আপনি তাকে ভুলতে চেষ্টা করুন, যদি মান-সম্মান এবং প্রাণ বাঁচাতে চান, যদি চান লজ্জা দুঃখ আর ঘৃণার হাত থেকে মুক্তি পেতে !

—তা কি সম্ভব, রবীনবাবু !

—মানুষ সব পারে ! পারে বলেই সে শ্রেষ্ঠ জীব !

রবীনের হঠাৎ নজর পড়ে সামনে। অত ভীড় কেন ! ভীড় জমবে তাতে আর আশ্চর্য কি ! যেখানে মধু, সেখানেই ভ্রমরের আনাগোনা।

এই ব্যাপার নিয়ে একদিন তর্ক উঠেছিল। একটি মেয়ে বলেছিল—মেয়েছেলে যে সীটে থাকবে, তার সামনে যত অশিক্ষিত মূর্খদের ভীড় !

রবীন বলেছিল—শিক্ষিতর দল ভীড় করলে অবশ্যই খুশী হতেন। এরা ভাল জামা-কাপড় পরে এসে দাঁড়ালে আপনারা কিছু বলেন না। বরঞ্চ নিজেকে ধন্য মনে করেন ! আপনাদের এত প্রসাধন সামগ্রী, এত বড় ষ্টাইল তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, সবার কাছে প্রশংসনীয় হতে পারা ! কিন্তু এ হীন চেষ্টা কেন ? মনেপ্রাণে আপনারা কোন্ দরবারে এগিয়ে যাচ্ছেন বল্তে পারেন ? কোন্ আবেদনপত্র পেশ করছেন দৈনিক ?

মেয়েটি বলেছিল—তাহলে আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটু প্রসাধন সামগ্রী মেখে মনটাকে প্রফুল্ল না রাখি ? ম্লেচ্ছর মত চলি-ফিরি।

আপনি বাস্তবিকই আপনার মনের কথা বলছেন না ! রহস্যটাকে সম্পূর্ণ চাপা দিতে চাইছেন ! তাই যদি নাই হবে, তবে কেন পাচজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোথাও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা ! তবে কেন দেখেন আয়নায় বিশবার নিজের চেহারা ! চুল্টা কিভাবে বাঁধলে ভাল দেখা যাবে, কি ভাবে কাপড় পরলে সুশ্রী ফুটে উঠবে, কেমন করে পেন্ট্ করলে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে ! এসব কথা তো আপনারাই বলে থাকেন ! জানি যুগের

পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব উদ্ভূত হয়েছে! সেজন্য আপনাকে দোষারোপ করতে চাইনে। অস্বীকার করছেন, এইজন্য দুঃখ ?

হ্যাঁ, জানি, পুরুষজাতি মেয়েদের এমনিধারা ছোট বানিয়ে রাখতে চেষ্টা করে! পরাধীনতার শৃঙ্খল দেয় পরিয়ে।

—তাহলে অনুগ্রহ করে আর একটু শুনুন মেয়েদের গুণগান! এই পূজোর সময়! সেদিন আমি গিয়েছিলাম বিখ্যাত এক কাপড়ের দোকানে। নজরে পড়লো কর্তা বেচারা দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রীর পেছনে নীরবে। স্ত্রী বসে আছেন শোফায়। শাড়ী, সায়া ব্লাউজ, ছেলে-মেয়েদের জন্য প্যান্ট-জামা কিনলেন পছন্দ করে! ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুশো টাকার নোট বের করে দিলেন। কিন্তু ধুতিপরা নিরীহ বেচারার জন্য কিছুই হলো না, এমন কি একবার মুখ তুলে একটু জিজ্ঞাসাও করলো না। দেখা গেল ভদ্রলোকের মুখখানা ব্যথায় এতটুকু হয়ে গেল। যার অর্থ তার কিছুই হলো না।

আজ মাধবী ফোন্ করে ডেকে এনেছে রবীনকে। সকালে তার ছোট বোন মিনতি নিশ্চুপে ফোনে বলেছিল—রবীনকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরে থাকতে।

রবীন এক-একবার মাধবী ও মোহনের প্রেম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আবার তা সহজ বিশ্বাসের দাপটে শতখণ্ড হয়ে উড়ে যায়। সত্যরূপে দেখা দেয় তার অন্তরে।

আজকাল রবীনের সাথে পত্রালাপ করে মাধবী। তার ছোট বোন মিনতি মারফৎ এ সব আদান-প্রদান হয়। সে যখন স্কুলে যায়, তখন অফিসের অন্যান্য সবার দূরত্ব বুঝে টেলিফোন্ তুলে বলে দেয় রবীনকে স্কুলের কাছে আসতে। চলে যায় রবীন।

প্রায়ই দু'খানা পত্র আসে। একটি মোহনের আর একটি রবীনের। মোহন উত্তর লিখে দেয় রবীনের কাছেই। সে দু'খানা আবার দিয়ে আসে মিনতির কাছে পরদিন সাড়ে দশটায়। অথবা স্কুলের ছুটী হবার পর।

মোহন আজও জানে না—মাধবীর সাথে রবীনের পত্রালাপ

চলে। রবীনই সেকথা জানাতে নিষেধ করে দিয়েছে মাধবীকে। কারণ, মানুষের মন বলা যায় না, হয়তো খারাপ কিছু ভেবে বসতে পারে। তার ফল বিষময় হয়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরের সাধনার হাসি-কান্না চিরতরে অবলুপ্তি পাওয়া, অসম্ভব কিছু নয় বিশ্রী রকমের সন্দেহে।

সেদিন হঠাৎ রবীন পেলো মাধবীর একখানা পত্র। মিনতির হাত থেকেই পেলো।

'সুচরিতেষু—

রবীনবাবু, আপনি আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আমাকে যে সান্ত্বনাবাণী দিয়েছেন, আর সেই সাথে দিয়েছেন যে হিতোপদেশ, তা ভুলবার নয়। এভাবে আমায় কেউ দেখেনি। কিন্তু দুঃখিত হলাম আপনার সবিনয় নিবেদন দেওয়ার জন্য। বড় আঘাত পেলাম সেখানে। শেষে আপনিও আমাকে ভুল বুঝলেন? আজ সকালে টেলিফোনে বলেছিলেন যে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারিনি, একথা কী করে ভাবতে পারলেন। জগতের সবাইকে আমি সরল মনে গ্রহণ করি, কিন্তু পরিণামে সে বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। আপনি জানেন না, জীবনে আমি কত আঘাত পেয়েছি। এমন কি আমার বাবার কাছ থেকে চরম আঘাত লাভ করেছি। অথচ বাবাকে আমি একদিন আট-নয় বছর বয়সে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম কৌশলে। ভাবছেন—বাবাকে কে না রক্ষা করে! তা হয়তো সত্যি! তবে বড় হয়ে বাবাকে কোনদিন মধুর স্বরে 'বাবা' বলে ডাক্‌তে সাহস করিনি! একদিন মোহনের জন্য বাবার কাছে কত কথা শুনেছি। অন্যায়ভাবে বকলে, তার প্রতিবাদ করে কত লাঞ্ছিত হয়েছি। যাক্, আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে। আমার জীবন কাহিনী আপনাকে শুনাবো, তাতে বুঝতে পারবেন সব কিছু। একদিন কেন, বহুদিন আপনাকে বলেছি যে, আমি আপনাকে সবচেয়ে প্রিয়জন এবং পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করি। বন্ধু বলেই আপনাকে ভাবতে পারি না। যে আমার জীবন কাহিনী লিখছে, তাকে

করবো অবিশ্বাস! এ ধারণা আপনার কী করে হলো, বলতে পারেন? আপনাকে অবিশ্বাস করলে কি যত মনের কথা আপনাকে খুলে বল্‌তে পারি!

আপনি নিজেকে অত ছোট করে দেখেন, কেন? বলে দিলাম একদিন আপনার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তখন থাক্‌বে কি আমার কথা?

আমার কত কি আদর্শ ছিল। বড় নাম করা সঙ্গীতশিল্পী হবো। দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়বে নাম। এই ছিল কামনা ও বাসনা। কিন্তু বাবা-মা মেয়ের আদর্শকে বাস্তবে রূপ নিতে দিলে না।

আশা ছিল—ছোট একটি সংসারের আদর্শ মা হবো, নিজে বড় হতে পারিনি, সে আশা সন্তানের মাঝেই পূরণ করবো। কিন্তু কোন আশাই আমার পূর্ণ হলো না! অবশেষে প্রেমের দিক্‌ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে মনে ভাবলাম সাহিত্যে ভাব ও ভাষা ফোটাবো। বড় বড় লেখকের ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে দৈবাৎ আপনার সাথে আলাপ হলো। মোহন জানতো আমার মনের কথা। তাই একদিন আপনাকে আমার সব কথা বললো।

ভগবান বোধ হয় আপনার মারফৎ আমার এ আশাটা পূরণ করবেন। পাশ করবার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু বিধাতা তাতে বাদ সাধছেন। তাই আজ দেড় মাস যাবৎ এই দুর্ভোগ।

যাক্‌ অনেক। এবার চলি। ।যতি টানবার আগে জানাই একটি কথা। আপনার কাছে মিনতি বা আমি ফোন্‌ করবো, তখন জিজ্ঞাসা করা হবে—কত নম্বর? আপনি বলবেন দুই নম্বর তাহলেই বুঝা যাবে আপিনিই কথা বলছেন।

চলার পথে আকুল টানে—
কোথায় যাব কেউ না জানে,
আমার কথা তোমার যদি নাইবা মনে রয়,
লিপিখানি দেবে তোমায় আমার পরিচয়।

প্রীতি অন্তে নমস্কার রইলো! ইতি—

এরা এইভাবেই পত্র দেয়। নিজের নাম দেয় না। দেয় কোন পুরুষের নাম। তেমনি মোহনও তাকে চিঠি দেবার সময় লিখতো —ইতি গায়ত্রী।

তেমনি রবীন যখন মাধবীকে পত্র দিত, তখন নিজের নাম দিত —স্বপ্না, কখন যূথিকা, নয়তো শিবানী।

আজ পার্কে বসে মাধবী বলছে তার মনের কথা। রবীন শুনছে নীরবে। কখনো দুঃখ প্রকাশ করছে।

মাধবী বললে—আমার জীবনে ভগবান শান্তি লেখেননি। আমার ব্যথা-দুঃখ অসীম অনন্ত। আমি কত কৌশলে চলাফেরা করি, কত আশায় ঘর বাঁধি, কিন্তু সে ঘর ভেঙ্গে চুরমার্ করে দেয় মোহন।

—কিন্তু প্রেমটাকে উপভোগ করতে পারছেন! বলে রবীন।

কী করে চিঠি লিখি জানেন? রাত্রে যখন সবাই ঘুমায় তখন!

—বলেন কি! অবাক হয় রবীন।

—কি করবো, উপায় নাই! ঘরে বাইরে বিপদ! মেজবোন চপলার সদা সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি। উঁকি দিয়ে দেখবে—আমি কি করছি! একদিন মা ধরে ফেলেছিল। সেদিন চিঠি লিখতে লিখতে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। প্রায় আট পৃষ্ঠা লিখেছি। মা দরজায় দাঁড়িয়ে। চেপে ধরলেন আমায়। কাপড়ের ভেতর থেকে টেনে বের্ করলেন কাগজ-কলম। অমনি চিঠিখানি আমিও কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলাম। মা চীৎকার করে উঠলেন। মুখে হাত চাপা দিলাম। তারপর থেকে প্রায়ই লক্ষ্য করেন রাত্রে ঘুমাতে কত দেরী হয়।

রবীনের চমক লাগে? পুরুষ চতুর বলে গর্ব করে। কিন্তু তার গর্ব্ব নারীর কাছে মূল্যহীন, তুচ্ছ!

রবীনের আরো বিস্ময় লাগে। কারণ, বোনেরা মনে-প্রাণে এক। সব কথার আদান-প্রদান হয়। তাই বললে মাধবীকে।

মাধবী জবাব দেয়—আমাদের ভেতর সেটার অভাব! ও যদি মতি না পাল্টায়, আমি তাকে কিছুই বলবো না।

—একদিন আপনার বোনের এ মতির পরিবর্তন হবেই! তখন তিনি অনুতপ্ত হবেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মাধবী বললে—জানেন—চপলা মোহনকে ঘৃণা করে। একদিন মোহনকে দেখে এসে আমায় বললে—ঐ ভাবে মোহন চলে! ছিঃ, সাধারণ পোষাকে চলাফেরা করে! সে কথায় আমার বড় দুঃখ হয়েছিল। পরদিন পঁচিশ টাকা দিয়ে জামা-প্যান্ট তৈরী করিয়ে দিই।

—তিনি বুঝি খুব ষ্টাইল করে চলেন?

—হ্যাঁ, পুরোপুরি ষ্টাইল!

—আপনার ছোট বোন মিনতিকে এমন চমৎকার টেনিং দিয়েছেন যা দেখে-শুনে আমার তাক লেগে গেছে! ওকে ফোন্ করা শিখালেন কী করে? আর কি করেই বা চিঠি-পত্র দেওয়া-নেওয়া শিখালেন?

হাস্‌লো মাধবী। বললে—অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে রবীনবাবু! দেশলাইয়ের বাক্সর সাথে সূতো বেঁধে তার কানে ধরিয়ে বাইরে থেকে তার অন্য প্রান্তে কথা বলেছি। কী ভাবে টেলিফোন্ ধরতে হয়, তাও ঐ ভাবে দেখিয়ে দিয়েছি। চিঠি-পত্রের বেলায়ও গোপনে অনেক উপদেশ দিয়েছি। সেদিন মোহন ওর হাতে এক খানা বই দিয়েছিল। ও মাঝে মাঝে ভয় দেখায়। একদিন সবার সামনে বলেছে আমাকে—দিদি, তোমার গল্পের বইগুলো যত্ন করে আর রাখতে পারবো না। আজ বন্দনাদি কাল বিভাদি এমনিভাবে সবাই বই দিয়ে যাবে, আর আমি সেগুলো রাখবো বুঝি। শুনেই আমার মাথা ঘুরে উঠলো। ও মুচকি হেসে পালালো। তাড়া করেছিলাম। ও বললে—আগে মিষ্টি খাওয়াও।

রবীন বললে—ওর পরকালটা ঝর্-ঝরে করে দিলেন

দেখবেন, ও বড় হলে আমাদের চেয়ে এক সিঁড়ি উপরে চলবে। এখন থেকেই পাকা হয়ে উঠছে। হাসলো সে।—আগে আমার ছোট ভাই নিমাইকে দিয়ে ঐ সব কাজগুলো করাতাম। এখন ও

বড় হয়ে গিয়েছে। আই-এ পড়ছে। পেকেও গেছে বেশ। ইংরাজীতে কত রসের গান গায়। হাসলো মাধবী।

—তাহলে আপনিই ভাই-বোনেদের প্রমোশন দিয়ে দিচ্ছেন।

দু'জনেই হেসে উঠলো। রবীনের হাসি সীমা লঙ্ঘন করে ছড়িয়ে পড়লো, পাশ দিয়ে কতজন চলে গেল। কেউ গেল হাসতে-হাসতে। কেউ বলতে বলতে গেল—আহাঃ জোড় অক্ষয় হোক।

মাধবী তা শুনে আবার হাসলো। বললে—শুনেছেন তো। মানুষের ধারণা কি! যদি পথ দিয়ে বোনের হাত ধরে যান, তাহলে শুনতে পাবেন—প্রেম করে হায় পরাণ রাখা দায়। আজকের জগৎ হচ্ছে এই। আর তাদেরই বা দোষ দেবো কেন। পথে-ঘাটে সর্বত্রই যে এই রীতি চলছে।

রবীন বললে—আপনি সেদিন মাষ্টারের সম্বন্ধে কী বল্‌ছিলেন? একটুও বুঝতে পারিনি সেদিন।

—ও! ক্লাস সেভেন্ থেকে এক মাষ্টার আমাকে পড়াতেন। তিনি বি-এস-সি পাশ। আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। যৌবন তখন সবেমাত্র এসে আমাকে স্পর্শ করেছে। কানে-কানে বল্‌ছে কত কথা, আর শোনাচ্ছে কতরকম ঝঙ্কার! তার বছরখানেক পর থেকে মাষ্টারমশায় আমার পেছনে লাগলেন। চেয়ার-টেবিলে পড়া-শুনা করতাম। তিনি পা দিয়ে আমার পায়ে খোঁচা দিয়ে হাসতেন। কখনো আমার ঘাড়ে হাত রাখতেন। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। একদিন আমার হাত চেপে ধরলেন। ভাবলাম চীৎকার করি। মুখ দিয়ে স্বর বের হলো না। শেষে একদিন বললাম—আমি চীৎকার করে বলে দেবো! উনি বললেন—বেশ ভালই হবে! তাহলে তাঁরা বুঝতে পেরে আমার সাথে বিয়ে দেবেন। মহামুস্কিলে পড়লাম।

—আপনার মা-বাবা পড়াশুনা দেখতেন না?

—তাঁরা আপন কাজেই ব্যস্ত। শুনুন, একদিন তিনি আমায় বললেন—আমি তোমায় কত ভালবাসি, আর তুমি আমায় উপেক্ষা করো কেন? বললাম—বিয়ে না হলেও আপনাকে বিয়ে করতে

যাবো না—মনে রাখবেন। তারপর নানা অজুহাতে তাঁকে বিদায় দিলাম। তবুও তিনি প্রায়ই আসতে লাগলেন।

—বাসে কি ঘটেছে বলছিলেন!

—বলছি! সেদিন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে এসে আমায় ডেকে বলছেন—তুমি এখনও কথাটা ভেবে দেখো! তোমার আশা আমি ছাড়তে পারিনে, মাধবী। আমি একটু রেগে উঠেছিলাম সেদিন। বিয়ের পর বৌ নিয়ে এসেছিলেন বেড়াতে। তাঁরা মা-বাবাকে বলে আমাকে নিয়ে গেলেন বাসায়। বাসে বসে আছি, উনি পা দিয়ে আমার পায়ে চাপ দিচ্ছেন। একবার না সহ্য করতে পেরে বৌটাকে ডেকে বললাম—বৌদি, এই দেখুন কি হচ্ছে! মাষ্টারমশায় তখন ভালমানুষের মত অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। বৌটা ভারী বোকা! স্বামীর পরামর্শ মত আমায় বললেন—ওঁর সাথে মাঝে-মাঝে আমাদের ওখানে যাবেন। বুঝলাম বৌটা ভারী সরল।

রথীন বেশ একটু চিন্তিত হলো। পরে বললে—তাঁকে বিয়ে করলেন না কেন?

—আসল কথাটা কি জানেন। তিনি বেঁটে। বেঁটেদের মোটেই পছন্দ করি না। তাছাড়া ও লোকটা কালো।

রথীন বললে—হিউম্যান সাইকোলজিতে কি বলে জানেন। বলে আজকালকার মেয়েরা চায় পাশ করা কোন সুদর্শন ফিলিম-ষ্টারের মতন স্বামী, অর্থাৎ তেমনি লম্বাচওড়া; আর ছেলেরা চায় সুন্দরী অভিনেত্রীর মত বউ হোক।

—কিন্তু বাবার মত দুর্ব্যবহার যদি স্বামী করে, তাহলে আত্ম-হত্যা করবো। বাবা আমাকে কতখানি সবার কাছে হেয় করেছে, জানেন। তার পরিচিত যত ভদ্রলোক আসেন, যত অফিসার আসেন, তাঁদের কাছে বলে—বড় মেয়ের কথা ছেড়ে দিন। ও বদ্ হয়ে গেছে। কোথায় কার-কার সাথে দিন-রাত বেড়ায়। ও একটা পাপ এসে জুটেছে সংসারে।

—বলেন কি। অবাক হয়ে যায় রবীন।

—হ্যাঁ, শুনুন্। মাধবীর চোখে এসেছিল জল। চোখ মুছতে মুছতে বললে—সেদিন এই সুযোগ নিয়ে এক অফিসার সিঁড়ির কাছে ডেকে আমায় বলছে—কেমন আছেন? আপনার চেহারাটা কেন যেন রাত দিন মনে হয়। এই বইখানা নিন্; মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, খুব ভাল বই। বাজারে এগুলো পাওয়া যায় না। সেক্স নলেজ বাড়বে, ভালও লাগবে। আমি নিতে চাইলাম না। বললাম দাদার কাছে দেবেন, আমি ও বই নিতে পারবো না। রাগে তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। একবার ভাবলাম চীৎকার করি। কিন্তু পারলাম না, ছুটে চলে গেলাম।

ছিঃ-ছিঃ। আপনার বাবার কি মাথা খারাপ। এভাবে কাউকে বলা উচিৎ হয়নি। রেগে যায় রবীন।

জানেন, এই লজ্জা-ঘৃণায় কোথাও মুখ দেখাতে পারিনে। আমার ঘরে স্থান নেই, বাইরে স্থান নেই। কোথায় স্থান পাবো বল্‌তে পারেন রবীনবাবু? বাড়ীতেও চোখের জল ফেলতে হয়। আমার মৃত্যু না হলে শান্তি নেই। মাধবীর চোখের জল গড়িয়ে পড়লো ছ'ফোঁটা!

রবীনের বুকখানা ব্যথায় ভরে গেল। বললে আপনার শান্তি সেই এক জায়গায় আছে, সে হচ্ছে স্বামীর ঘর। বিয়ে হলে মা-বাবাও আদর করবে, শ্বশুর বাড়ী থেকেও আদর পাবেন; আর মোহনও বুঝবে যে, এ নারী পথের ধূলো নয়, এ হচ্ছে পরশমনি। তাই বিয়ে করতে আপনাকে অনুরোধ করি। একদিন আমায় এজন্য মুখে না হলেও মনে-মনে প্রশংসা করবেন। বলবেন, এমন বন্ধু আর পাওয়া যাবে না। আমার আশা সার্থক হয়েছে।

*

* *

রবীনের নাম আজকাল অনেকেই করে। মানুষের প্রতি তার ভালবাসা আর কর্তব্য অপরিসীম। সে যাকে উপকার করতে বসে তার জন্য মন-প্রাণ ঢেলে দেয়। এটা তার ধর্মও বলা চলে।

বহুদিন পরে কলকাতা থেকে একবার বাড়ীতে গিয়েছিল রবীন। তার মা এতদিন পথ চেয়ে ছিলেন। এবার তিনি ছেলেকে কাছে পেয়ে নারায়ণ পূজো করলেন। নিমন্ত্রিত হলো পাড়ার প্রত্যেকে। সন্ধ্যা হতেই খাওয়ানোর ধূম পড়ে গেল। লোকজনে ভরে গেল বাড়ী। সবাই খেয়ে গেল, কিন্তু তখনও খেতে আসেনি রবীনের প্রথম জীবনের প্রেয়সী মনা। আসেনি তার ছোট ভাইবোনগুলো। রবীন যেয়ে ধরে নিয়ে আসেনি, তাই হয়তো অপরাধ এবং অভিমান।

অবশেষে সে মাকে বলে বড় একটি 'টর্চ' নিয়ে বের হলো পথে! টর্চের আলোর তীক্ষ্ণ ছুড়ীতে অন্ধকারের বুক চিড়ে এগিয়ে চললো সে। কিছুক্ষণ পরেই পেয়ে গেল মনাদের বাড়ী। অন্দর মহলে প্রবেশ করলো মনাকে ডাকতে ডাকতে। ওর মা বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন—এসো। এতক্ষণে আমাদের কথা মনে পড়েছে?

রবীন বললে—মনে তো সর্বদাই পড়ে, কিন্তু উপায় কি? মনা বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালো হেসে। বলেল—আজ সারাদিন পদার্পণ করতে দেখলাম না এ বাড়ীতে!

কাজটা বুঝতে পারছো না। রবীন বললে—সে সব কথা পরে হবে, এখন চলো তো লক্ষ্মীটি।

—কোথায়?

জানোনা বুঝি? এসো তাড়াতাড়ি।

মনার মা বললেন—ও এসেছে যখন—যা, ঘুরে আয়গে।

না, আমি যাবো না।

দেখ মনা, আমি কিন্তু মারতে জানি, এরপর মার খাবে বলে রাখছি! ভাইবোনেদের সাথে নিয়ে এসো।

—না, বাচ্চারা কেউ যাবে না, বাবা। মনার মা বললেন।

দাঁড়িয়ে রইলো রবীন। মনা তার খুড়তুতো বোনকে সাথে নিয়ে এলো। বললে—চলো এবার।

ওদের সাথে নিয়ে পথ বেয়ে চলে রবীন। মনা সুযোগ পেয়ে

বলে—কলকাতায় গিয়ে আজকাল কেমন হয়ে গেছো যেন। বাড়ীতে আসতে চাও না। প্রায় তিন চার বছর পর এলে। তোমার বাসার ঠিকানাটা আমায় দেবে ?

—কেন বলোতো ?

আমি একবার যেয়ে দেখে আসতাম, ওখানে তোমার কে আছে! কার মোহে তুমি জড়িয়ে পড়েছো! সন্ধান করে বের করতাম!

হো-হো করে হেসে ওঠে রবীন। বলে—পেলে কি করবে ?

—তার চুলের মুঠি ধরে টান্তে টান্তে পথে নাবিয়ে তিন্টে আছাড় দিতাম।

—কিন্তু সে যদি তোমার চেয়ে শক্তিমতী হয় ?

—তাহলে তুমি আছ কেন ?

—সেই রণস্থলে আমি কৃষ্ণ হয়ে ভীম-জরাসন্ধের বিক্রম দেখে অবস্থা বিবেচনা করে ইঙ্গিত করবো—

মনার বোন লীলা ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো। এখন সে যৌবনের রসতরঙ্গে ফুটন্ত, উল্লসিত। পাঁচ বছর আগেও সে ছিল ছোট খুকু, রবীনের ছাত্রী। আজ সে বয়সের পদতলে নিষ্পেষণ করেছে সেই দিনগুলো। মনাও তাকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছে। মেয়েদের চৌদ্দ এবং আশিতে প্রভেদ নেই।

পুকুরের পাশ দিয়ে টর্চ ধরে ওরা চলেছে। আঁধারের চরম প্রশান্তি আর নীরবতা। এপাশে পুকুর, ওপাশে বিরাট আম বাগান। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। জোনাকীরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। আগে রবীন পথ প্রদর্শক। পেছনে ওরা দুজন। মাঝে মাঝে ওদের ফিস্‌ফিসানি শোনা যাচ্ছে।

রবীন বললে—তোমরা ফিস্‌ফিসিয়ে কি যুক্তি করছো বলতো ?

—কিছু না! মনা ও লীলা দুজনেই বললে।

ঠিক তার পরমুহূর্তেই ওরা দুজন ভূত-ভূত বলে প্রাণপণে জড়িয়ে

ধরলে রবীনকে। হেসে উঠলো রবীন। দাঁড়িয়ে পড়লো সে। বললে—সত্যিই মনা, তোমরা দুটোই পেত্নি! আর আমি হচ্ছি ভূতের ঠাকুরর্দ্দা ব্রহ্মদোত্যি! পাগলামী কর্মো না, ছেড়ে দাও। নইলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে যে—

—না, মস্ত বড় ভূত দেখলাম। তাইনা লীলা?

—হ্যাঁ, সত্যি?

রবীন আবার হেসে উঠলো। বললো—বেশ, তোমাদের কথাই মেনে নিলাম, এবার চলো তো লক্ষ্মীটি! কারো চোখে এ দৃশ্য পড়লে তোমাদের কলঙ্ক রটবে। আর আমাকে বলবে—ছাত্রীর সামনে প্রথম প্রণয়িণীর প্রেম-রসে ডুবেছে? তাও প্রতাপ-শৈবলিনীর মত আমবাগানে? আর ছাত্রীও যদি আপ-টু-ডেট হয়, তাহলে হয়তো মুখের উপর কিছু বলেও বসতে পারে, কিম্বা করবে অভিযোগ।

*

* *

সেদিন এক লাইব্রেরীতে রবীনের ছবি নিয়ে আলোচনা চলছিল। রবীন যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। থেমে দাঁড়ালো।

চশমা চোখে এক ভদ্রলোক বলছিলেন—এই সব ছবি মানুষ দেখে! একেবারে বাজে ছবি।

রবীনের মুখ খুললো। বল্‌লে—কোন্‌গুলো কাজের ছবি বল্‌তে পারেন?

—কেন রবীন্দ্রনাথের ছবি।

—রবি ঠাকুরকে কবে থেকে চিনতে শিখলেন! এ ভক্তি আগে কখনো জাগেনিতো।

কে বলেছে জাগেনি!

—আমি বলছি। আগে তাঁকে এতটুকু স্থান দেননি। তাঁর

লেখা কজন আদর করেছে ? কোন্ পত্রিকা সমাদরে গ্রহণ করেছে ? যখন বিদেশ থেকে নোবেল পুরস্কার পেলেন, সেদিন থেকে তাঁকে আপনারা চিন্‌তে শিখলেন। সেদিন আপনারা গেলেন ষ্টেশনে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতে ! কেন ? কেন এই রাতারাতি অনুরক্ত পরম ভক্ত সাজা ? তখন বাংলায় শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল কি ? আপনারাই ছিলেন। আপনারাই তাঁর দুর্নাম রটিয়েছেন, আবার আপনারাই গুরুদেব বলে চীৎকার করছেন ; কেন এই পরের মুখে ঝাল খাওয়া ? বাঙ্গালীর চোখ আছে, তবে পরের চোখে ভাল দেখতে পায় ! তার শ্রী আছে, কিন্তু পরশ্রীকাতর ! ঝাল খায় তবে অপরের মুখে।

তাঁদের ভেতর থেকে একজন বললেন—কথাটা মিছে বলেননি !

আজ শরৎবাবুর আসন টলানো যায় না। কিন্তু বেঁচে থাকতে তিনি কতটুকু সমাদর লাভ করেছেন আপনাদের কাছ থেকে ? বরঞ্চ তাঁকে আসন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। দাঁত পড়ে গেলে, তখন তার মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর হন, আগে নয়। শুধু এই কথা মনে রাখবেন যে, শ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না।

সেখান থেকে চলে গেল রবীন। যেতে যেতে শুন্‌তে পেলো, তাঁদের ভেতর থেকে কে যেন বললেন—লোকটা পাগল ! তা শুনে মনে মনে হাসলো রবীন।

রবীন এত কথা যখন বললো, তখন একথাটুকুও বলা উচিত ছিল অবশ্যই যে, সবাই উত্তম সৃষ্টি করবার প্রয়াসী। কিন্তু তার অন্তর থেকে যা প্রেরণা পায়, তা সীমাবদ্ধ। সবখানি অমৃত এক পাত্রে এনে দেওয়া অসম্ভব। কোন পাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার অজ্ঞাতেই ভরে, কোনটা থাকে অসম্পূর্ণ। ভাল-মন্দতে গড়া বিধাতার সৃষ্ট পৃথিবী !

দেশবন্ধু পার্কের নির্জ্জন কোনে স্থান নিয়েছে সে। বসে বসে কত কি ভাবছে। এমন সময় দেখা তার এক বন্ধুর সাথে। বসলো সে রবীনের পাশে। অনেক কথাবার্তার পর সে বললে—আজ বৌদি কী বলেছে জানো ? একচোট হেসে নিলে বন্ধুটি।

—কী ?

—ঠাকুরপো, তোমার পিয়ারীকে নিয়ে এসো বাসায়। পাশের ঘরটা ছেড়ে দেবো, আরামে থেকো ! বললাম—আমি রাজী আছি, কিন্তু সে রাজী হবে না। সে না করবে।

বৌদি খানিকটা হেসে বললে—শোন তবে একটা ঘটনা ! আমি যে অফিসে কাজ করতাম, তার পাশেই ছিল একজন ফিমেল্ সিনেমা আর্টিষ্টের বাড়ী। তার লাভার ছিল এক বড়লোকের ছেলে। নাম ছিল শ্যামলকান্তি।

সে একদিন সন্ধ্যায় ফোন্ করে মেয়েটিকে বললে—আজ কোথাও যেয়ো না, আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি।

—আচ্ছা এসো ! হেসেই জবাব দেয় মেয়েটা। শ্যামল গিয়েছে পরম আশায়। দু'চারটে কথাবার্তা হবার পর মেয়েটি অসম্মতি জানালো। বললে—না !

কিছুক্ষণ পরে হতাশ হয়ে ব্যথা ভরা বুকে ফিরে গেল ছেলেটা। যখনই বাসায় ফিরেছে, তখনই ফোন্ করেছে মেয়েটি। বললে—শ্যামল, তুমি রাগ করে চলে গেলে !

তুমি আমার সাথে আর কথা বল্‌বে না ! বলে লাইন্ কেটে দিতেই মেয়েটি বললে—শোন শোন !

—কি !

—তুমি একটা আস্ত বোকা ! মেয়েদের সব না সত্যি নয়, কতক না হ্যাঁ বলে ধরে নিতে হয় !

তুমুল হাসির ঝড় বয়ে গেল। নড়ে উঠলো গাছের পাতা। কেঁপে উঠলো আমার বুকের পাঁজরাগুলো।

প্রায় সপ্তাহখানেক আগের কথা। সন্ধ্যায় রবীন ও মোহন বসে আছে অফিসে। ফোন্ করলো মাধবী মোহনের সাথে কথা হবার পর রবীনের সাথে কথা হলো। সে সাক্ষাৎ করতে চায় মোহনের সাথে রবীনের ঘরে। অসম্মতি জানায় রবীন। অবশেষে আপত্তির

সম্পূর্ণ কারনটা জানবার জন্য রাস্তার মোড়ে সাক্ষাৎ করতে বললে রবীনকে।

নির্দিষ্ট সময়েই হাজির হলো। অনেকক্ষণ পরে এলো মাধবী। রবীনকে সাথে নিয়ে. অফিসের দিকে এগোতে চায়। রবীন তাকে বললে যে, তার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে, সুতরাং যাওয়া উচিত হবে না।

তাই তাকে সাথে নিয়ে গেল পাশের এক নির্জন পার্কের দিকে। অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। মাধবী সযত্নে লুকানো একটা কৌটা বের করে তা থেকে দুখানি পীঠে দিয়ে রবীনকে বললে—খান্। অনেক কষ্টে এনেছি।

—এসব আনতে গেলেন কেন!

—আপনাদের না খাওয়ালে আমার শান্তি নেই! ওগুলো চুরি করতে কাল ধরা পড়ে গিয়েছি।

—চুরি করেছেন! রবীন বিস্মিত হয়, অস্বস্তিও বোধ করে।

কি করবো, সবার সামনে নিয়ে আসা যাবে না! তাই ভোরবেলা উঠে অন্ধকার ঘরে পা টিপে টিপে কোনমতে দরজা খুলে মার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম বাবা ও মা দুজনেই ঘুমিয়ে আছে। তখন আস্তে আস্তে খাটের তলায় ঢুকে পড়লাম! বড় বড় তিন-চারটে বাটীতে। তিন-চার রকমের পিঠে ছিল। দুটো বাটীর ঢাক্না তুলে সবেমাত্র চার-পাঁচখানা বের করেছি এমন সময় আমার হাতের সামান্য ধাক্কা লেগে একটা বাটির উপর থেকে কাঁসার থালা পড়ে গিয়ে বেজে উঠলো ঝন্-ঝন্ করে।

এ শব্দে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। লাফ্ দিয়ে উঠে আলো জ্বেলে চেয়ে দেখলো। বললে—হ্যাঁরে, তুই এখানে এত রাতে কী করছিস?

—আমি নীরব! সহসা কোন কথা এলোনা মুখে। মাথা নীচু করে বসে রইলাম। মা কী কাজে অন্য ঘরে গেল। ইত্যবসরে আমি বুদ্ধি স্থির করলাম। মা ফিরে এলেই বললাম—কী করবো

খিদে লেগেছিল তাই দু একখানা তুলে নিচ্ছিলাম! অন্যায় করেছি কিছু?

—মা কথাটাকে সত্যি ভেবে বললে—বেশ করেছো। আর আমিও তৎক্ষণে কৌটা নিয়ে আমার ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি তারপর সোজা বইয়ের আলমারীর ভিতর ঢুকিয়ে তালা চাবি দিয়ে ফেলেছি। আজ আসবার সময় চপলা বারবার লক্ষ্য করছিল—আমি কি করি। কিন্তু আমার বুদ্ধির সাথে পারবে কে! বিশদ বিবরণ দিলে মাধবী। বিস্মিত হলো রবীন।

সেদিন পার্কে বসে অনেক কথা-বার্তা হলো। এমন সময় এক-জন লোক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। রবীনের অফিসের সে একজন পিওন। দেখলো, বুঝলো সবই। লজ্জিত হলো রবীন। লোকটা নিশ্চয়ই সবাইকে বলে দেবে অফিসে গিয়ে। কথাটা রটে যাবে—মাধবীর সাথে তার প্রেম। মোহনও নিশ্চয়ই শুনবে। তাহলে কি হবে?

একটু পরে মাধবী বললে—মোহনকে পাঠিয়ে দিতে। রবীন তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বটে, তবে সে অফিসে আর ফেরেনি।

আজ রবীন বিকাল বেলা বের হয়ে গেছে। যাবে তার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে তার অনেকগুলি শিশুবন্ধু আছে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সে। সেই বাসার প্রায় কাছেই হচ্ছিল নামকীর্তন। মুহূর্তে তার মন নেচে উঠলো। দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কীর্তন শুনলো। কী চমৎকার ঝঙ্কার! কতকাল পরে শুনছে এই কীর্তন। যখন সে বাড়ীতে থাকতো, তখন শুনতো এই গান, আর শুনছে আজ। দীর্ঘ দশ বছর পরে। এগান তার কত প্রিয় ছিল।

তন্ময়তা ভেঙ্গে যখন রবীনের সম্বিৎ ফিরে এলো, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে! সর্বাঙ্গ তার ঘেমে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো গেছে অবশ হয়ে। চলতে পারে না। অনেক কষ্টে চললো সে বাসার দিকে। হঠাৎ তার সর্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠলো। ঘাম

দেখা দিল সারা গায়ে। গলা বুক শুকিয়ে গেছে। সম্বিৎ প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

বহু কষ্টে স্বস্তির আশায় পাঁচতলায় উঠলো আত্মীয়ের বাসায়। বাইরের পড়ার জন্য যে ছোট একটু ঘর ছিল, তারই ভেতর ঢুকে ধপাস্ করে বসে পড়লে একখানা চেয়ারে।

রবীনের পরম অনুরক্ত বিজয় নামে একটি ছেলে ছুটে এসে তার অবস্থা দেখে অবাক হলো। আরো কয়েকটি শিশু এলো, তারা হাসলো। ভাবলে—রবীনদা বুঝি তাদের সাথে মজা করছে!

অবশেষে তাকে একটু চা খেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে সন্ধ্যায় মেঘ গর্জন আর বৃষ্টিপাতের ভেতর বিনা বাধায় চলে আসতে হয়েছিল।

সেখনে থেকে সুস্থ হবার আশায় গেল তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাসায়। কলকাতায় এসে অবধি সেখানে পেয়েছিল সব চেয়ে বেশী আদর, সবচেয়ে বেশী সহৃদয়তা। এরা মানুষকে ভালো বাসতে জানে, এরা জানে মানুষকে আপন করে নিতে।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর রবীন তার বন্ধুর বাসায় ঢুকলো। নেবে এলো তুমুল বৃষ্টি। রবীনকে তারা যথেষ্ট যত্ন করলো। রাতে খেয়ে-দেয়ে বন্ধুর পাশেই আশ্রয় গ্রহণ করলো রবীন। অবসাদে এলিয়ে যায় দেহ মন।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো তার ঘরের কথা। আজ সন্ধ্যায় মোহন মাধবীকে সাথে নিয়ে ঘরে দু'এক ঘণ্টার জন্য আসতে চেয়েছিল। মোহনের অবশ্য মত ছিল না রবীনও তাকে সমর্থন করেছিল গাম্ভীর্য-সহকারে। কিন্তু মাধবীর ভয়ে মোহন আসতে চেয়েছিল। তাতে নীরব ছিল রবীন। হয়তো তারা ঘরে ঢুকেছিল, ঘরের চাবি যে দরজার উপরে লুকানো থাকে মোহন তা জানতো।

পরদিন সকালে ফিরলো ঘরে। দরজা খোলার শব্দ হতেই অফিস থেকে চীৎকার করলে এক ভদ্রলোক—কে, রবীনবাবু নাকি;

—হ্যাঁ। উত্তর দেয় রবীন।

—মশায় কাল সারারাত কোথায় ছিলেন?

—আমার এক বন্ধুর বাসায়।

—আপনার ঘরে কাল রাতে কে এসেছিলো জানেন কিছু? একটি মেয়েকে নিয়ে মোহনবাবু এসেছিল বৃষ্টির ভেতর। ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেতেই চীৎকার করলাম, কেউ সাড়া দিলে না। তারপর কুঁজো থেকে জল ভরে খাবার শব্দ পেলাম, কেউ কথা বল্‌লো না। এর কিছুক্ষণ পরেই শুন্‌তে পেলাম ঘরের ভেতরে চুড়ির টুন্‌-টুন্‌ শব্দ। প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে চলে যাবার সাড়া পেয়ে গেলাম গেটে'র কাছে। দেখলাম দু'জনকে। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? মোহনবাবু বললে—রবীনবাবুর কাছে গিয়েছিলাম! বললাম—উনি ঘরে আছেন? উত্তর পেলাম—হ্যাঁ। অথচ সরারাত আপনাকে পেলাম না! কী ব্যাপার বলুন তো?

—কী জানি! আমি তো এর কিছুই জানি না। গাত্রদাহ হয় রবীনের।

তারা অবিশ্বাস করছে যেন রবীনকে। ভাবলে—সে নিশ্চয়ই সব জানে। বলে—বড় সুবিধাজনক মনে হলো না! বৃষ্টি ঝরা রাতে! তারপর পরিচয় দিলে—মেয়েটি নাকি তার আত্মীয়া! এটা কী রকম আত্মীয়তার লক্ষণ, বুঝি না।

মোহন অফিসে আসতেই রবীন সব বললো। মোহন যেন লজ্জিত হলো, তেমনি রেগেও গেল লোকটির উপর। বললে—তার বলবার বা দেখবার কী অধিকার আছে?

কাল ধরা পরবার পরে মোহন মাধবীর সাথে বেশ রাগারাগি করে চলে গেছে। বলেছিল যে, তার সাথে সম্পর্কের এখানেই শেষ, আর নয়।

সন্ধ্যায় ফোন্‌ করলো মাধবী। রবীনকে রাস্তায় যেতে অনুরোধ করলো মোহন রবীনকে সাবধান করে দিলে।

—ওকে নিয়ে আসবেন না। আনলে আপনি বিপদে পড়বেন।

তাকে আনবে না আশ্বাসেই রবীন গেল পথে! দাঁড়িয়ে আছে, অথব কারো পাত্তা নেই। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠলো। তার পেছন

থেকে গায়ে শাল জড়ানো, বেঁটে ফুল্‌প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক বল্‌লে —চিন্‌তে পারছেন না?

রবীন অবাক হোল। এ আবার কে! শুধু মুখটুকু দেখা যায়। কে? অবশেষে কথায় ধরে ফেললো। মনে মনে প্রণাম করলো এই বহুরূপী নারী জাতিকে। এদের চেনা দুষ্কর, বোঝা ভার। যারা শক্তি বুদ্ধি ও কৌশল নিয়ে এগোতে পারে, তারাই কেবল পারে এদের পোষ মানাতে অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করাতে। তারাই জয়ী হয় সংসার-সংগ্রামে।

মাধবী বললে—চলুন আপনার ঘরে।

অসম্মতি জানায় রবীন। বললে—মোহনবাবু নিষেধ করছেন।

—আমার জন্য নাকি ধরা পড়লো, তাই পণ করেছে আমার সাথে আর মিশ্‌বে না! তাই আজ বুঝিয়ে বলবো, চলুন! কোন ভয় নেই! কেউ আমায় দেখে বুঝতে পারবে না।

রবীনের দুর্বলতা ওখানেই। মেয়েদের দুঃখ সহ্য করতে পারে না, পারে না তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে।

মাধবীকে সাথে নিয়ে এলো রবীন। দরজা খুলে দিয়ে মোহনকে পাঠিয়ে দিতে গেল। রেগে উঠলো মোহন। রাজী হলো না দেখা করতে।

রবীন ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলো মাধবীর অর্দ্ধ অনাবৃত দেহলতা। কাপড় পড়ছে সে। ফিরে গেল রবীন। পাঁচ মিনিট পরে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকলো।

মাধবী সেজে বসে ছিল রবীনের বিছানায়। রবীন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে সব। মাধবী বললে—সে না এলে এখান থেকে আমি যাব না।

রবীন গেল বটে মোহনকে আনতে, কিন্তু আবার হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হলো। বললো—মোহনবাবু আসবেন না! আপনি এখান থেকে না গেলেও তাঁর কোন আপত্তি নেই!

মাধবী তার দিকে কাতর নয়নে চাইলো। সে দৃষ্টিতে অনেক

কথা, অনেক ব্যথা! রবীন বেচারীর উভয় সঙ্কট! ভয়েও বুক কাঁপছে! পাছে কারো নজরে পড়ে! নিরুপায় হয়ে মোহনকে করযোড়ে অনুরোধ করলো ক্ষণেকের জন্য তার সথে দেখা করতে। অবশেষে মোহন রাজী হলো। গেল বটে, তবে সেই মুহূর্তেই ফিরে এলো।

রবীন বিস্মিত হলো। বললে—কথা হয়ে গেল?

সে কথা বললো না, আমি কথা বলতে যাবো কেন। তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এসেছে সে। উত্তর নাই।

রবীনের কাতর অনুরোধে মোহন আর একবার গিয়েছিল। কিন্তু মাধবী বের্ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল অবস্থা বিবেচনা করে। মাধবী নাকি তার রুঢ় ব্যবহারে কেঁদেছিল।

রবীন তাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিতে গেল। যেমনি পোষাকে এসেছিল, তেমনি ভাবেই চলে গেল মাধবী। যেতে যেতে কিছুটা কাঁদলো। রবীন সান্ত্বনা দিলে অনেক।

মাধবী বললে—আমি নাকি ওর কথা শুনে বের্ হয়েছি, তাই ধরা পড়তে হয়েছে। কিন্তু ও ভুলে যাচ্ছে যে, একদিন ওর বোকামীর জন্য ধরা পড়লাম মায়ের কাছে আর পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোকের কাছে। অথচ আমি সে কথা বলে ওকে আঘাত দিতে চাইনি।

আপনাকে নাকি আসতে নিষেধ করেছিলেন বৃষ্টির ভেতর। আর আপনি তাঁকে যা খুশী তাই বলেছেন।

—হ্যাঁ, বলেছিল। মাধবী মেনে নিলে।—কিন্তু আগে আমাকে কথা দিয়েছিল কেন?

এরপর প্রশ্ন করে রবীন জানতে পেলো যে, মাধবী তার দাদার ফুলপ্যাণ্ট আর একখানা শাল নিয়ে লুকিয়ে বের্ হয়ে পাশের নির্জন স্কুল ঘরে ঢুকে পোষাক পাল্টিয়ে এসেছে। যাবার সময়ও ঐখানেই পোষাক পরিবর্তন করতে হবে। হাতের চুড়িগুলো রয়েছে শাড়ীর আঁচলে বাঁধা, সেগুলোও পরতে হবে।

পরদিন মোহনের সাথে সেই ভদ্রলোকটির দেখা হইতেই হলো একটা তুমুল গণ্ডগোল। ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করতেই রাগে ফেটে পড়লো মোহন। বুঝিয়ে দিলে যে, তার এ বিষয়ে বল্‌বার কিছু অধিকার নেই, আর যা বলবার ছিল বলেছে এবং উত্তরও সে পেয়েছে।

এই টেলিফোন করা নিয়ে আর একদিন দু'জনের সাথে বচসা করে রবীন। কিন্তু ওদের জানতে দেয়নি সে কথা। পাছে মাধবী ভুল বুঝে বসে যে, রবীন তার প্রণয় প্রার্থী বা স্বার্থান্বেষী। রবীনের সহজ মন বিশ্বাস করতে পারে না তাদের কলুষতা। লোকে বললেও মন তার মানতে চায় না। নিজের মনেও কখনো সন্দেহ জাগে, কিন্তু স্থান পায় না! যে অসৎ, সে সাবইকে সৎ ভাবতে পারে না।

এর কয়েকদিন পরে ফোন্ করলো মাধবী। তখন বারোটা বাজে। রবীনকে একবার নির্দিষ্ট রাস্তায় দেখা করতে বললে। তারপরই জিজ্ঞাসা করলে তার খাওয়া হয়েছে কিনা। রবীনের তখনও খাওয়া হয়নি শুনে তিরস্কারই করলো আত্মীয়ার স্বরে।

বিকালবেলা রবীন তার সাথে দেখা করলো মাধবী, তাকে নিয়ে নির্জনে বসতে চাইলো। চললো পথ বেয়ে।

—সেদিন ফোন্ করে আপনাকে বলেছিলাম না, যে, একটি মেয়ে আপনার কাছে ফুল চাইবে? সে ফুল খুব ভালবাসে। আমার সে ক্লাসফ্রেণ্ড। আপনার কথা সে প্রায়ই বলে। আপনি ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন সম্বন্ধে যে রচনা লিখে দিয়েছিলেন, তা আমারও খুব ভাল লেগেছে, ওর মনমত হয়েছে।

রবীন কচি ছেলে নয়। তার দুধের দাঁত অনেকদিন পড়েছে। সে বোঝে যে, মাধবী কী বলতে চায়। সে চায় নীতাকেও একই দলভুক্ত করতে। রবীনের পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ দিতে চায় অর্ঘ্য। মাধবীর উপর ঘৃণা এলো, ওরা ভাবে, সবাই বুঝি একই ছাঁচে গড়া। ডাকলেই পাওয়া যায়, হাসলেই উন্মাদ হয় পাবার জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে এক সাহেবের বাগান বাড়িতে দু'জনে বসেছে। মাধবী মোহনকে যে মর্মঘাতী পত্র দেবে তাই পড়ে শুনাবে রবীনকে।

কিন্তু সাহেব বেরিয়ে এসে তাদের উঠিয়ে দিলে। অবশেষে দু'জনে যেয়ে বসলো এক মুসলমান বস্তীর পাশে ছোট একটু মাঠে।

মাধবী চিঠিখানা তারে হাতে দিলে। পড়লো সে নীরবে। বড় করুণ পত্রখানি। হয়তো সহ্য করবে না মোহন। দারুণ রেগে উঠবে রবীন তবু জানে যে, সে পারবে তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে।

মাধবী বললে—রবীনবাবু, আমি বিয়ে করবো! বাবা পাত্র দেখছেন। তবে মোহন একদিন কাঁদবেই। আর কাঁদলেও আমাকে সে পাবে না।

এরপর রবীন পত্র নিয়ে দেয় মোহনকে। টান্ দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে। পড়তে বললো রবীনকে। পড়ে তাকে সান্ত্বনা দিলে। বললে—মানুষ অনেক রকম হয়ে থাকে।

মাধবী এর আগে যতগুলি পত্র দিয়েছে মোহন তার সবগুলিই রবীনের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং আজও দিচ্ছে। রবীন সেই পত্র থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। মাধবী আগে তা জানতো না, আজকাল জানতে পেরেছে মোহনের কাছে।

সেই সব পত্রের ভেতর অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে—তুমি বলে আমার সাথে এমন ব্যবহার করছো, রবীন হলে এমন করতো না; সে প্রেম জানে, সে খাঁটি মানুষ, আমায় সে মাথায় তুলে রাখতো।

রবীনকে একদিন বলেছিল মাধবী—আপনার মত এমন সংযমী লোক আমার চোখে পড়েনি, আপনি মহান!

রবীন মাঝে মাঝে মিনতির কাছ থেকে ফোন পেয়ে তার স্কুলে যেতো। নিয়ে আসতে বাধ্য হতো রান্না মাংস অন্যান্য মিষ্টি। খেতো দু'জন। মাধবী অবশ্য পাঠাতো মোহনের জন্যই তবে রবীনকেও অর্ধেক গ্রহণ করতে বলতো স্বার্থ রক্ষার্থে, রবীনের তাই মনে হয়েছে। কখনো নিজেই দিত রবীনের হাতে। খেতে বলতো দু'জনকে। রবীন অনেক সময় ভেবেছে, মাধবীও যেন তাকে ভালবেসে ফেলেছে বেশী। শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে!

মাধবী ইডেন গার্ডেনে বসে বেলা এগারোটার সময় গল্প করছিল

রবীনের সাথে। সেদিন পরীক্ষার এড্‌মিট্‌কার্ড আনতে যাবে, মাধবী মোহনকে আগেই বলেছিল এই সময়ে দেখা দিয়ে যাত্রা সার্থক করতে।

মোহন আসতে পারেনি। তার বৌয়ের সাথে সেদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিল রবীনের হাতে একখানি পত্র রেখে। সেই সাথে চপলার পত্রের উত্তরও ছিল।

চপলা আজ কয়েকদিন হলো নতি স্বীকার করেছে। ক্ষমা চেয়েছে দিদির কাছে। যৌবন নিশ্চয়ই তাকেও পাগল করে তুলেছিল। তাই মনের কথা বলবার জন্য দিদির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে মোহনকে পত্র দিয়েছিল।

রবীন পত্র ছুটি নিয়ে দিলে মাধবীকে। সে পড়ে রেগে উঠলো। ফিরিয়ে দিলে পত্র ছ'খানি। কারণ, সে নাকি পত্রে সম্বোধন করেনি। এবং কোনদিনও করে না। তাই তার ক্ষোভ। অথচ সে লেখে—সুইটেষ্ট মোহন কিম্বা প্রিয়তম।

মাধবী বললে—জানেন, ওর জন্য বন্ধু-বান্ধবের কাছে কতখানি লজ্জিত হই! দেবীর লাভার বিরাজবাবু দেবীকে কত কি জিনিষ পত্র দেয়, কত কি খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়! অথচ আমি ওর কাছ থেকে কিছুই পেলাম না। আরো নিজের টাকা থেকে খরচ করে খাওয়াই, সিনেমা দেখাই, জামা-কাপড় দিই। সেদিন আমরা সবাই যখন সিনেমা দেখি, তখন দেবী ও বিরাজবাবুকে বললাম যে, মোহন দেখাচ্ছে। কিন্তু সব টাকা আমার। বিরাজবাবু আমাকেও কত খাওয়ায়, অথচ আমি—

—তাই নাকি! হাসলো রবীন।

—পূজোর সময় বিরাজবাবু দেবীকে দামী জামা-কাপড় আর হার দিল, চম্পার লাভার দিল চম্পাকে, রীতার লাভার দিল রীতাকে কিন্তু মোহন আমাকে কিছুই দিলে না। জানি তার অভাব। তাই বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে বলি—আমার জন্যে ওকে কিছু খরচ করতে দিইনে, খুব রাগ করি, তাই সাহস পায় না।

রবীন অবাক হয় এর কথা শুনে! কার প্রিয়তম কি দিল, তাই বলে এরা দুঃখ করে। প্রশংসা করে অপরের প্রিয়তমকে। ওরা যেমন চুষে খেতে চায় প্রিয়কে, এও তাদের মত চায়। কিন্তু জানে না যে, জোর করে আদায় করলে প্রিয়তমকে আঘাত দেওয়া হয়। স্বার্থ খোঁজা হয়, কিন্তু পরার্থ দেখা হয় না। প্রেমের খাতায় দৈহিক ভোগ যেমন অবৈধ, তেমনি দাবীও অন্যায়।

রবীনের বিস্ময় লাগে—দেবীর নতুন একজন প্রিয়তম এসেছে! কিন্তু কবে থেকে? এরা কি নিত্য নতুন বাসা বাঁধে? খোঁজে কি নিত্য নতুন ভ্রমর? হয়তো তাই! এর নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ আছে, আছে আরও বাড়ী-গাড়ী। তাই একে মেনে নেয় দেবী। থাক, সে মোহনের কাছে ভালো করে শুনবেই!

মাধবী আরো বলেছে যে, দেবী, চম্পা বা রীতা তাদের লাভারদের যখন যা হুকুম করে, তখন তাই শোনে।

হায় নারী! তুমি নিজেকেই দেখতে শিখলে, প্রিয়কে দেখতে চাইলে না। ভালো শাড়ী, গহনা এবং টাকা না পেলে তুমি অসহ্য বোধ করো, কিন্তু ফিরে চাওনা ছেঁড়া কাপড় পরা তোমার ভদ্র-লোকটির দিকে। আর পাঁচজনের সাথে তাল রেখে চল্‌তে পারলে না—এই তোমার কাছে সব চেয়ে বড় হলো! কিন্তু যা পাবার, সেটা তো রূপে-গুণে খাঁটি পেয়েছো!

* *

*

রবীনের এক সহকর্মী সমীরণ সেদিন সন্ধ্যায় অফিসে বসে দুঃখ করছে। বলছে রবীনকে তার প্রাণের কথা। বউ হাসপাতালে আছে। যক্ষ্মা হয়েছে। বিয়ে হবার এক বছর পরেই তার এই অবস্থা। বয়স মাত্র ষোল।

বৌটির নাম সুলতা। অত্যন্ত পতিভক্তিপরায়ণা। এখনও স্বামী সপ্তাহে একবার দেখা করতে গেলে তাকে পনেরো হাত দূরে

থাকতে বলে। বলে নাকে রুমাল ধরতে! লক্ষ্য করে তার আপাদমস্তক। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বলে। বলে আরো ভালো ভালো খাবার খেতে। নিজের কথা মুখেই আনে না!

যখন সুলতা তার কাছে থাকতো, তখন সে ভোর বেলা উঠে স্বামীর নির্দেশমত তাকে ডেকে দিত। ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করেই স্বামীকে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলা মাথায় নিত। তারপরে যেতো বিধবা শ্বাশুড়ীর কাছে। তাঁকেও তেমনি প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে স্নান করে এসে রান্নাঘরে ঢুকতো। যখন সবার খাওয়া হয়ে যেতো, তখন সে খেতো অবশিষ্টাংশ নিয়ে।

একদিন সমীর দুপুরবেলা মায়ের অজ্ঞাতে কয়েকটি রসগোল্লা আর সন্দেশ এনে সুলতার হাতে দিয়ে বলিছিল—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও!

জবাব পেয়েছিল কঠোর ভাষায়!—তুমি চুরি করে আমায় খাওয়াচ্ছ। মা—যিনি কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করেছেন, যিনি তোমার মুখ চেয়ে আছেন, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে আমাকে খাওয়াবে! না, আমি তা কখনো খেতে পারবো না। রাগ করে চলে গেল সুলতা দেবী।

অগত্যা সমীর মায়ের হাতে মিষ্টিগুলো তুলে দিলে। মা বললেন —হ্যাঁরে, মিষ্টি আমাকে দিলি কেন, বৌমাকে দে! ও খেলেই আমি খুশী হবো।

সমীর বললে—ও তোমাকেই দিতে বলেছে!

ওমা, সে কি কথা! হাসলেন খানিক। খুশীই হলেন। মুখে বলে পরীক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু মন সে কথায় সায় দেয়নি। মেয়েরা সংসারের প্রাণ, সংসার ধর্ম তাদের প্রতি শিরায়-শিরায় প্রবহমান! মৃত্যুপথের কাছাকাছি এলেও তারা ভুলতে পারেনা কর্তৃত্বের কথা, সংসারের সংস্কার!

সমীর একদিন সুলতাকে বললে একটা সমস্যার কথা। চাইলো উপদেশ। রেগে উঠেছিল সুলতা। বলেছিল—দেখ, তুমি আমার

পূজনীয়, তুমি আমার চেয়ে সর্ব্ববিষয়ে বড়। উপদেশ দেবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে কিছু বলতে পারি—তুমি ভেবে দেখ্‌তে পার।

সমীরের মা একদিন ছেলেকে বললেন—বাবা তুমি আর একটা বিয়ে করো, আমি তোমার মুখের দিকে আর চাইতে পারি না। সুলতাকে নিয়ে আর সংসার করা চলবে না, ভাল হয়ে গেলেও না।

সমীর সেই কথামত রেগে শ্বশুরকে পত্র দিয়েছিল। লিখেছিল যে, এ রোগ নিশ্চয়ই আগে ছিল, এবং সে আবার বিয়ে করতে বাধ্য হবে।

হাসপাতালে যেয়ে বৌয়ের কাছে এই কথা বলতেই কেঁদে ফেললে সুলতা। বললে—তুমি বিয়ে একটা কেন, দশটা করতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়বো না। আমার যেটুকু অধিকার সেটুকু নিয়েই আঁকড়ে পড়ে থাকবো।

যদিও শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে—ডাক্তার বলেছে, তবুও তোমায় পাঁচ বছর বিশ্রাম দিতে হবে। তুমি তো আর সংসারের কোন কাজ করতে পারবে না।

—কেন পারবো না, আমি সব পারবো—আমি সব করে দেবো, তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না! আগে যে কাজ করতাম, তার চেয়ে বেশী কাজ করে দেবো—কাউকে আনবার দরকার হবে না।

হায় আশা! নিজে মরবে, তবু কাউকে বধূরূপে আনতে দিতে রাজী নয়। হায় নারী জাতি! ধন্য তোমার কামনা তোমায় প্রণাম।

সেদিন রবীনের মাথা নত হয়ে এলো সেই অদৃশ্য সুলতা দেবীর কাছে। পরদিন সমীরণের সাথে গিয়েছিল হাসপাতালে। একখানা বই দিয়ে এসেছিল। সান্ত্বনাবাণীও দিয়েছিল। আধুনিক জগতে সুলতা দেবী যেন একা। তার মত আর কাউকে রবীনের নজরে পড়ে না। আদর্শের প্রতীক সুলতাদেবী।

মোহন আজ সন্ধ্যায় রবীনকে নিয়ে বসেছে ইডেন গার্ডেনে। পাশে বসে আছে মাধবী। আগের দিন রবীনের সাথে পরিচয়

করিয়ে দিতে চেয়েছিল দীপ্তির। ইচ্ছা করেই যায়নি রবীন। অবশ্যই যেতো, যদি মাধবী এর আগে ও রকম ইঙ্গিত না করতো।

তাইতো কাল মোহনের উপর রেগেছিল মাধবী। অনেক কিছু বলেছিল। চুপ করে ছিল তার প্রিয়তম। দোষ যেন তার।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে কথায-বার্তায়। এরা উঠতে চায়, উঠতে দিতে রাজী নয় মাধবী।

এক সময়ে সে বললে—শোন, আমি বিরাজবাবু আর দেবীর সাথে কাশ্মীর যাচ্ছি। তুমি যাবে কি?

—না, আমার অত পয়সা নেই!

—আমারই কি পয়সা আছে। বিরাজবাবু দিচ্ছে, তাই যাচ্ছি! পরীক্ষাও শেষ হলো, আর গরমও পড়েছে, ভালই কাটানো যাবে।

—মাধবী তুমি না আমাকে ভালবাসো।

—হ্যাঁ, বাসি!

—এটা কি সেই ভালোবাসার নিদর্শন বলতে চাও। আমি যাবো না—তুমি যাবে, আমি গরমে কষ্ট ভোগ করবো, তুমি আনন্দে দিন কাটাবে! বললে মোহন—কথাটা বলবার আগে একটুখানি চিন্তা করো।

—কেন, এটা কি খুব দোষের! এতেই কি প্রমাণ হয় যে, আমি তোমায় ভালবাসি না! তাই যদি বোঝ, তবে আমাদের এই স্বাধীন দেশের বড় বড় রাজকর্মচারীরা কি দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীকে ছেড়ে গ্রীষ্মাবাস করেন না দার্জিলিংয়ে? তাতে কি প্রমাণ হয় যে, তাঁরা দেশবাসীকে ভালোবাসেন না?

মোহন গম্ভীর হলো। বললে—দেশবাসীর সাথে সম সুখ-দুঃখ যারা ভাগ করে নিতে জানেন না, তাঁদের দেশপ্রেমিক বলিনা। তাঁদের কথা ছেড়ে দাও! আমি তোমার কথা বলছি!

—ও, তাহলে তুমি আমার স্ত্রীস্বাধীনতাটুকুও হরণ করতে চাও, মোহন।

—এটাকেই তোমরা স্ত্রীস্বাধীনতা বলো? ছিঃ! এটা যে

স্বার্থপরায়ণতার লক্ষণ! এটা যে প্রিয়জনদের প্রতি উপেক্ষার লক্ষণ, এই সহজ কথাটা বোঝ না কেন? আজ আমি যদি যেতাম, তুমি যদি থাকতে, তাহলে তুমি মর্মাহত হতে না কি? বেশ ভালো করে বিবেচনা করে দেখ মাধবী! আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বলতে যদৃচ্ছা-চারিতাকে করি ঘৃণা।

মাধবী বললে—বেশতো, তুমিও চলো না! বিরাজবাবুকে বললে তিনিই টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। চিন্তার কি আছে?

—বলতে তোমার লজ্জা করলো না! তার কাছ থেকে টাকা ধার নিলে তোমার আমার গৌরব কি ক্ষুণ্ণ হবে না? হবে না কি আমাদের মাথা তাঁর কাছে অবনত? তবে তোমার কথা আলাদা। কারণ! কারণ তুমি আগেই তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে!

—কি বললে! সহসা গর্জে ওঠে মাধবী। সাবধান! আর যেন ও মুখে এ কথা না শুনতে পাই! তুমি আমাকে কুকুর ভেবেছো? আমার মান-সম্মান কি কিছুই নাই?

—ছিল জানতাম, এখন আছে কিনা জানিনা!

—অর্থাৎ?

অর্থাৎ যেদিন থেকে শুনলাম তুমি বিরাজবাবুর সাথে গিয়ে সিনেমা দেখেছো, খেয়েছো রেষ্টুরেন্টে! নিজে চোখে যেদিন দেখলাম তুমি কলেজ থেকে ফিরছো বিরাজবাবুর গাড়ীতে তারই পাশে বসে, সেদিন থেকে আমার মনে দাগ লেগেছে। তোমরা চাও গাড়ী বাড়ী আর ঐশ্বর্য!

—ছিঃ মোহন, তোমার অন্তর এত নীচু! মাধবী বললে—তুমি আমায় বিশ্বাস করো। বলো, এই কি সেই বিশ্বাস! যার উপর নির্ভর করে আমার স্বাচ্ছন্দ্যতা, সেই ভরসা কি এই!

—দেখ, আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু কপট বিশ্বাস পছন্দ করি না। প্রেম করতে পারি, কিন্তু তোমার হাতের পুতুল হতে চাইনে। তোমরা একজনের সাথে প্রেমের খেলা করো, তবে মন থাকে অন্যদিকে। অন্ধকার দূর করতে প্রদীপ ধরো প্রিয়কে পথ

দেখাতে, কিন্তু সে আলো যে কোনদিকে প্রতিফলিত হয় কাকে শুভেচ্ছা জানাতে, তা একা তুমিই কি বোঝ? আজ নারী স্বাধীনতা লাভ করে যেমনি এগিয়ে চলেছে ধাপে ধাপে, তেমনি নিজেকে ক্ষুদ্র করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে ধ্বংসের পথে। উপাস্য দেবীর পরিবর্তে স্থান এসেছে নেবে সহজ লভ্যতায়। নিজেরাই নিজেকে ক্ষুদ্র করে গড়ে তুলছো কর্মে।

কথা বললো না। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রইলো মাধবীলতা।

রবীন বললে—আপনারা এখানে কি ঝগড়া করতে এসেছেন?

মাধবী বললে মোহনকে—"এই কারণেই কি সেদিন বলেছিলে দেবীর সাথে না মিশতে?

—দেখ মাধবী, যখন যে কথা বলি, সেটাকে দামী কথা বলে মেনে নেবে! যদিও বলা উচিৎ নয়, তবু বল্‌বো তোমার বন্ধু চরিত্রহীন!

—মোহন, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে যা খুশী বলো, কিন্তু অন্য কারো চরিত্রের উপর দোষারোপ করো না। তারপর রবীনকে বললে—শুনুন, দেবী এক ভদ্রলোকের কাছে গান শিখতে যেতো। আরো অনেক শিখতো সেখানে। একদিন সেই ভদ্রলোক দেবীকে তার ঘরে ডাক দিলে। দেবী গিয়েছিল, তবে ভদ্রলোক যা বললে, তাতে সেদিনকার মত অস্বীকার করে। পরে আর একদিন ডেকে নিয়েছিল। যদি জবরদস্তি করে কেউ অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাতে অপরাধটা কার? মেয়ের না ছেলেটির?

রবীনের মন বল্‌লে—এটা আজকাল এদের কাছে কোন অপরাধ নয়! দোষ কাটানোর উপায় জোর-জবরদস্তী! কিন্তু আইনের ঘরে তা টেঁকে কি!

মোহন বললে—আহাঃ, তিনি বাইশ বছরের কচি খুকী! কিছু বোঝেন না! বেশ, আর একদিন নাকি সেই সদাশয় ভদ্রলোক ডেকেছিল।

—সে অন্য একটি মেয়েকে! কি হয়েছিল জানিনা।

—সেখানে কতজন মেয়ে গান শেখে? জিজ্ঞাসা করে রবীন।

—দশ-বারোজন! অবশ্য টাকা দিতে হয় না কাউকেই!

মোহন বললে—হুঁ। ভদ্রলোকটির নাম কী?

—বিদ্যুৎ পাল।

রবীন অফিসে বসে আছে। তার এক সহকর্মী গল্প করছে। মন দিয়ে শুনছে রবীন। প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। একদিন রাত একটার সময় রেড্ রোড্ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল মৃদুমন্দ গতিতে। রাস্তায় ছিল এক কনেষ্টবল পাহারারত। সন্দেহ হলো তার। গাড়ী থামালো।

দেখা গেল এক ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে আছে। পাশে তার এক সুন্দরী যুবতী! মনে হলো বড়লোক দু'জনেই মিষ্টি আতরের গন্ধে আর মদের গন্ধে ভরপুর।

মেয়েটি বললে—গাড়ী থামালে কেন?

কনেষ্টবলটি জবাব দিলে—সন্দেহ হচ্ছে!

তুমি আমাদের চেনো! জানো আমরা কে! ইচ্ছা করলে রিপোর্ট দিয়ে তোমার চাকরী খেতে পারি! মেয়েটি বললে।

কনেষ্টবলটি শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলে। সহসা ভয় পাবার ছেলে নয়। বললে—বেশ, থানায় চলুন, তারপর যা খুশী তাই করবেন। আপনারা চাকরী খেতে পারেন, দিতে পারেন না!

গাড়ীতে চেপে বসলো কনেষ্টবল। ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বললে। মেয়েটি এবার ভয় পেলো।

গাড়ী ছুটে চললো। মেয়েটি হাত থেকে চার গাছি সোনার চুড়ি বের করে বললে—এই নাও ভাই, আমাদের ছেড়ে দাও! অন্যায় করেছি।

জানি। সেইজন্যই থানায় যেতে হবে?

এবার মেয়েটি তার হাত চেপে ধরলো। গলার দামী হার গাছি আর চুরি চারটে দিতে গেল। কিন্তু কনেষ্টবল ছাড়লো না।

মেয়েটি লজ্জায় দুঃখে আর ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। অবশেষে

সে যা আত্মপরিচয় দিলে, তা শুনে কনেষ্টবল চম্‌কে উঠলো! এও কি সম্ভবপর! যিনি মহামান্য, তাঁর কন্যা এই! ভাবতে পারা যায় না!

কনেষ্টবলটি বললে— ওগুলো দিন, আর প্রমাণ করিয়ে দিন যে, আপনি তাঁরই কন্যা।

অবশেষে গাড়ীটা তাঁর বাড়ীর সামনে থাম্‌লো। মেয়েটি ড্রাইভারকে একটি ঠিকানা দিয়ে ভদ্রলোককে সেখানে নাবিয়ে দিতে বললে। টাকাও দিলে দশটা। তারপর ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে যেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। দারোয়ান সেলাম ঠুকলো।

পরদিন সকাল বেলা কনেষ্টবলটি হার আর চুড়িগুলো নিয়ে হাজির হলো সেই বাড়ীতে। কলিং বেল টিপতেই সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন—কাকে চাও?

হার আর চুড়ীগুলো তাঁর হাতে দিয়ে বললে—দেখুন তো এগুলো আপনাদের বাড়ীর কারো কিনা!

এক নজরেই তিনি চিনতে পারলেন। ডাকলেন মেয়েকে। মেয়ে এলো। কিন্তু সাদা পোষাক পরিহিত কনেষ্টবলটিকে দেখে' চিনতে পারলো না মেয়েটি!

ভদ্রলোক মেয়েকে বললেন—দেখতো এগুলো তোমার না?

হ্যাঁ! ধরা গলায় উত্তর দিলে।

ভদ্রলোক ছেলেটীকে বললেন—তুমি কোথায় পেলে?

কনেষ্টবল বললে—কাল রাত দুটোর সময় রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিলাম, একখানা ট্যাক্সি যেতেই লক্ষ্য করে দেখি এগুলো কে যেন ফেলে দিলে। তুলে নিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখি গাড়ীখানা আপনাদের বাড়ীর সামনে থামলো, তারপর চলে গেল।

সেখানে আর এক মুহূর্ত দেরী করেনি কনেষ্টবলটি। চলে এসেছিল ছুটে। সে এই শাস্তিটুকু দিতেই চেয়েছিল।

রবীন শুনে তাজ্জব বনে গেল। যা ধারণার অতীত।

সেদিন মোহনের কছে আর একটা ঘটনা শুনেছিল! কলকাতার কোন এক শ্রেষ্ঠ অঞ্চলের কথা।

রাত তখন চারটে হবে। একটা পার্কের কাছে গাছের আড়ালে বসেছিল একজন কনেষ্টবল হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটি মেয়েছেলে কিসের একটা পোঁটলা ডাষ্টবিনে ফেলে দিলে এদিক-ওদিক চেয়ে। তারপর ছুটে পালালো।

সন্দেহ হলো কনেষ্টবল্‌টির। ছুটে গেল। ভালো করে লক্ষ্য করলো—একটা মৃত সন্তান কাপড়ে জড়ানো রয়েছে। লক্ষ্য করেছিল মেয়েছেলেটি কোন্ বাড়ীতে ঢুকেছিল।

সেই বাড়ীর দরজায় যেয়ে কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক।—এত রাতে কড়া নাড়্‌ছো কেন?

—একটু আগে একটি মেয়েছেলে কাপড় জড়িয়ে মৃত সন্তান ফেলে দিয়ে এসেছে ডাষ্ট্‌বিনে! তাকে ডেকে দিন।

—বাজে কথা বলো না বলছি। চলে যাও, ঘুমের ডিষ্টার্ব করো না। যত সব আপদ!

ভদ্রলোকটি দরজা বন্ধ করতেই কনেষ্টবল্‌টি বল্‌লে--দরজা দিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না, দরজা খুলুন বল্‌ছি! আমি ছাড়বো না, তাকে ডেকে দিন।

ভদ্রলোকটি অবশেষে বললেন—আচ্ছা, তুমি ঘরে এসো, আমি ডেকে দিচ্ছি!

—আপনি আমাকে বোকা পাঁঠা পেয়েছেন! ঘরে ঢুকি, আর আপনি বেশ হৈ-চৈ করে লোক জড় করে আমায় শাস্তি দিন! অতখানি ছেলে মানুষ নই জানবেন।

অগত্যা সে থানায় খবর দিলে। তাই নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ চলেছিল কয়েক মাস। পরে ন্যায় অন্যায় কি হয়েছিল জানা যায়নি।

বিজ্ঞান মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে জানি। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তার ধারক বা বাহককে দিয়েছে ফেলে বিভীষিকাময় অন্ধকার গহ্বরে। সভ্য জগতে লজ্জিত করেছে তাদের।

রবীন বললে—মোহনবাবু এ সব দেখতে দেখতে আর শুনতে

শুনতে চোখ পুড়ে গেছে, অন্ধ হয়েছি, আর কালা হয়েছি বেশ খানিকটা।

মোহন হাসলো। বললে—আজকের দিনের দু'চারটে ঘটনা শুনে রাখুন না! তাতে ক্ষতি কি, বরঞ্চ লাভ।

একদিন বিরাজবাবুর গাড়ীতে চড়ে মাধবী কলেজ থেকে ফিরছিল। পথের মাঝে রবীন আর মোহনকে দেখে মাধবী গাড়া থামিয়ে বিরাজবাবুর সাথে রবীনের পরিচয় করিয়ে দিলে। তাদের সম্বন্ধেও একটা গল্প লিখতে রবীনকে অনুরোধ করলো মাধবী।

বিরাজবাবু সিগারেট এগিয়ে দিলে রবীনের দিকে। সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলো অনেক কিছু ভেবে।

বিরাজবাবু আজ মাধবীর নির্দেশমত দেবী আর মাধবীকে নিয়ে এসেছিল সন্ধ্যায় রবীনের অফিসের সামনে। সেখান থেকে মোহন আর রবীনকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবে নির্জন এলাকায়। বলবে তাদের জীবন কাহিনী।

মাধবী বললে রবীনকে—আর একটা নিবিড় প্রেমের কাহিনী জানতে পাবেন আজ।

সেদিন বন্ধুর বাড়ীতে রেলিং-এর পাশে বসে রবীন আর বীণার অনেক কথা হয়েছিল। বীণা বলেছিল—আপনার সাথে আর কোন মেয়ের ভালবাসা হয়েছিল কখনো?

—হ্যাঁ।

—ক'জন?

—প্রাণের খাতায় তাদের নাম লেখা আছে, মুখস্থ নেই।

বীণা উৎসাহী হয়েই বলে—একটা ঘটনা বলুন না!

রবীন একটু ভেবে নিয়ে বলে—আমাদের গাঁয়ের কথা বলছি। সে মেয়েটা ছেলেবেলা থেকে একই সাথে খেলা-ধূলো করে যৌবনে পদার্পণ করেছিল। আমাদের বাড়ী ছিল তার প্রধান আড্ডা। ওকে আমার খুব ভাল লাগতো। নাম ছিল মেনকা। দেখতেও ঠিক তাই। কোন দিন তাকে না মেরে খাইনি। যদিও বয়সে

আমার চেয়ে ছোট ছিল, তবু সেও আমায় মেরেছে! কেউ কাঁদতাম না। মা দেখে হেসে অস্থির। বলতো—এক শ্রেণী হলে তোদের বিয়ে দিয়ে মজা দেখতাম। শুনে আমরা দু'জনেই লজ্জা পেতাম। মেনকা মুখ রাঙা করে পালাতো।

—তারপর? বীণা প্রশ্ন করে।

—যেদিন আমি বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতাম, সেদিন ও অস্থির হয়ে বারবার পথের দিকে চাইতো। দাঁড়িয়ে থাকতো দরজায় দু'চোখ মেলে। ভাল খাবার তৈরী হলেই সে তার মাকে বলে পাঠাতো আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে! যেদিন না যেতাম, সেদিন পাঠিয়ে দিত। যে জিনিষটা আমি ভালবাসতাম, সেটা বাড়ীতে তৈরী হলে অনেক সময় নিজেই ছুটে আসতো আমাকে নিয়ে যেতে। হাত এড়াতে পারেনি।

একটু মৌন থেকে রবীন আবার বলে যায়—মা ওকে বলতো—হ্যাঁরে, রবীনকে এত খাওয়ালে লোভ লেগে যাবে যে! সে বলতো—ও কথা বলবেন না, মাসীমা! ও যে নারায়ণ! নারায়ণকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই ধন্য হবো। মা বুঝতো—কত ভালবাসে মেনকা।

শুনতে শুনতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বীণার। মাথা নীচু করে শোনে রবীনের কাহিনী।

রবীন বলে—তাছাড়া বিকেলবেলা প্রায়ই আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যেয়ে মুখরোচক খাবার তৈরী করে খাওয়াতো। জিজ্ঞেস করতাম—মেনকা তোমার খাবার কোথায়? বলতো—আছে আপনি খান। পরে দেখতাম নিজেদের জন্য কিছুই রাখেনি। আমি বকাবকি করতাম। ও শুধু খিলখিল করে হাসতো। ওর মাও হাসতো। বলতো—ও খুশী হয় তোমাকে খাইয়ে। একটা অব্যক্ত নিবিড় ভালবাসা জমে উঠেছিল আমাদের মনে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময়—কোনদিন সেই ভালবাসার চরম প্রকাশ পাইনি ওর কাছ থেকে! ও যেন একটা ফুল। নিজের

সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যায় নীরবে, ধন্য হতে, আশার আবেদন পত্র পেশ করতে জানে না। সেটা ছিল তার কাছে নীতি বহির্ভূত।

বীণার মাথা তেমনি অবনত। নীরব নিস্পন্দ দেহ।

রবীন আবার বলে—কুল পাকলে, তার আচার তৈরী করে খাওয়াতো, আর আমের সময় কাঁচা আম খেতে দিত পরম যত্নে। খেতে দেবার সময় আমায় ডাকতো 'নারায়ণ' বলে। শুনে আমি হাসতাম!

থেমে যায় রবীন। এতক্ষণে বীণা মাথা তুলে চায় তার দিকে। বলে—তারপর তার বিয়ে কোথায় হলো?

—অনেক দূরে। তখন আমি কল্‌কাতায়। মায়ের চিঠিতে জানতে পেলাম—রাতদিন সে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। একবার নাকি দেখতে চেয়েছিল আমাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যেতে পারিনি।

বীণা রবীনের দিকে চেয়ে একবার কি যেন বলতে গিয়ে থেমে পড়লো। কিছু পরে বললে—আচ্ছা—একটা কথা বল্‌বেন?

—কি কথা?

আপনাকে পেতে হলে কোন্ মন্ত্রে, কী দিয়ে সম্ভব হয়, জানাবেন অনুগ্রহ করে?

সেদিন রবীন জবাব দিয়েছিল—বীণা, আমায় যারা ভালবেসেছে, তারা সবাই আমাকে পেয়েছে। কিন্তু দৈহিক সুখ-ভোগকে সত্যিকারের পাওয়া বলে না। আর—সে পাওয়াকে আমি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করি। ঘৃণা করি ঐ জাতীয় স্ত্রী-পুরুষকে, যারা নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে করে অত্যাচার দেয় ধ্বংসের পথে এগিয়ে, তাদের বলি পশু। তাদের নাম শুনলে, আপনা থেকেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে কখনো তাদের দুঃখে কাতর হয়ে পাড়! তার কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে মনে ছাপ পড়ে। দূরে যেয়ে আত্মগ্লানির অনলে পুড়ে মরি। মনে রেখো—

প্রেম আর কাম পাশাপাশি বসবাস করে, কিন্তু ভিন্নধর্মী। সেদিন বীণা একটি কথাও বলেনি।

মাধবী সেদিন বলেছিল যে, মেয়েদের যেগুলো হু'চক্ষের বিষ, সেইগুলো ছিল তার মাষ্টারের ভিতর। একে সে বেঁটে, তারপর মাথায় চুল সামান্য। আবার নাকটাও চোখা নয়, চোখটাও টানা নয়, রংটাও নয় ফর্সা। আর বয়েসটা ত্রিশের মাত্রা পেরিয়েছে তো বটেই! শুনে রবীন হেসেছিল।

ইডেন গার্ডেনের বেঞ্চে বসে ঝগড়া করেছিল মোহনের সাথে। বলেছিলে—তুমি সেদিন চাষার মত ছাতা হাতে বের্ হয়েছিলে কেন? না—বিজয়বাবুর কাছে আমাকে ছোট করে গেলে! তুমি তো বুঝবে না আমায় কতখানি লজ্জিত হতে হয়েছিল?

রবীন হতভম্ব। এ বলে কি! এটা কোন নীতি?

মোহন বললে—কেন, তাতে অপরাধ হয়েছে? এই কাঠফাটা রোদের ভেতর—

—হয়েছে! হয়েছে! কাঠফাটা রোদে! দেবী বিরাজবাবুকে কখনো ছাতা হাতে বের হতে দেয় না। রোদে পুড়বে, জলে ভিজবে, তবু না। আর বিরাজবাবুও তাই মেনে নিয়েছে!

অসহনীয় হয়ে ওঠে রবীনের কাছে। এরা লক্ষ্য করে অপরে কী করছে, এরাও তাই করে সুখী হতে চায়। তাতে প্রিয়তম কষ্ট পাক, তবু ভালো। এটাই এদের মূর্খতা, দুর্বলতার পরিচয়। এরা প্রয়োজন চায় না, মানে ভদ্রতা। দুঃখ পাক তবু ভালো, প্রমাণিত হয় না যেন বাবুয়ানার খুৎ। পরের মুখে ঝাল্ খেয়ে এরা বলে—বাহবাঃ।

আজ সন্ধ্যায় বিরাজবাবুর গাড়ীতে চড়ে রবীন, মোহন, দেবী ও মাধবী এসেছে গঙ্গার ধারে। অনেক জায়গা ঘুরে তবে এসেছে। দেবী বিরাজবাবুর পাশে বসেছিল। রবীনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল হু'টি সুসজ্জিত পুষ্পগুচ্ছ।

রবীনকে নিভৃতে পেয়ে সংক্ষেপে বলেছিল তাদের প্রেমের

কাহিনীটি। তারপর সেই চাঁদনী রাতে, গঙ্গার কুলে তৃণশয্যায় বসে গান শুনিয়েছিল মাধবী আর দেবী। এরপর সহাস্য নমস্কারের সাথে বিদায় সম্ভাষণ।

এমনিভাবে অনেকদিন কেটে গেল। দেবী আর বিরাজবাবুর সাথে যে ভালবাসা চলছিল, তাতে উভয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সবাই অনুমান করেছিলেন ওরা স্বামী-স্ত্রী! কিন্তু রবীন যা অনুমান করেছিল, সেই দুর্ভাগ্যের মসীতে ছেয়ে গেলে তাদের সম্ভোগ প্রেম। বিরাজবাবু বিয়ে করলো এক অল্প শিক্ষিত সুন্দরী গ্রাম্য মেয়েকে! আর দেবী? সে কেঁদে গড়াগড়ি খাচ্ছে! বিরাজবাবু অজুহাত দেখিয়েছে তার মা-বাবারে।

মোহন সেদিন রবীনকে ডেকে বলেছিল—এ জগতে যারা ছোট তাদের কোনমতেই বাঁচা উচিত নয়, আর সে আশা করাও ভুল! তারা মরবেই। যারা বড়, তারাই পায়ে পিষে মারবে তাদের।

রবীন বললে—কথাটা নেহাৎ মিছে বলেননি। সেদিনে বাসে চড়ে যাচ্ছি। একটা সাত-আট বছরের মেয়ে তার ঠাকুমার সাথে বসে আছে! বুড়ী যেন তার কাছে দন্তহীন মুখে অস্পষ্টস্বরে কী বললে! মেয়েটি বললে—'সত্যি কথা ঠাকুমা! এ জগতে যেন কেউ গরীব হয় না। তার বাঁচা মরা সমান। কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। রাজপথে গেলে লাঠি দিয়ে তাড়া করে, কারো সীমানায় গেলেও গালাগালি করে তাড়িয়ে দেয়। আচ্ছা ঠাকুমা, দেবতা কি অন্ধ! সে এসব দেখতে পায় না। 'সেদিন অতটুকু' মেয়ের মুখে এত বড় কথা শুনে ব্যথায় বুক ভরে গিয়েছিল।

মোহন এসে জানিয়ে গেল যে, একজন বিরাট ব্যবসায়ীর সাথে মাধবীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কাল তাই তাদের দু'জনকে নেমন্তন্ন করেছে বিশেষভাবে।

পরদিন রবীন আর মোহন গিয়েছিল! চর্ব্য-চোষ্য লেহ্যপেয় সহযোগে পরম যত্নে খাইয়েছিল মাধবী। তারপর শয্যা পেতে দিয়ে বিশ্রাম করতে বলেই রবীনকে বললে—রবীনবাবু আমার

এই জীবন আর প্রেম নিয়ে একটা ভাল উপন্যাস লিখতে হবে আপনাকে।

রবীন সেকথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল আবার মাধবী বললে—এরপর আমার সাথে, সম্পর্ক রাখবেন তো? না—ভুলে যাবেন? মোহন চলে যেতেই মাধবী ফিস্‌ফিসিয়ে বললে—এখনথেকে শত্রু হবে মোহন।

কাছে বসে তার কানে কানে বললে মাধবী—জানেন, আমি আপনাকে কত ভালবাসি? সেটাকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি আমরা?

রবীন বললে—শুধু ভালবাসা নয় সেটাকে সার্থক রূপায়ণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে।

মাধবী এতটা আশা করেনি। তাই তার কপালে ক্ষণেকের মধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল। তারপর এগিয়ে এসে চরণধূলি মাথায় নিল নতজানু হয়ে।

রবীন বললে—ভেবে দেখো মাধবী, কে কার মঙ্গলচিন্তা করেছে কে কাকে ভাসবেসেছে বেশী। আমি চাইছি তোমার মুখ থেকেই স্পষ্টোক্তি শুনতে! তার উপর নির্ভর করে আমি এগোবো।

মাধবীর মাথা নত হলো। হাসি ফুটলো তার মুখে, বললে—আমার এটা স্বপ্ন, কত দিনের আশা, তোমাকে বিয়ে করে ধন্য হবো; আজ যদি তা সত্যি হয়, তাহলে আমি সত্যিকারের ভাগ্যবতী। সত্যি করে বলো আমায় বিয়ে করবে?

—করবো কি, বিয়ে করলাম তোমাকে। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী মাধবীলতা। এবার খড়-কুটো জোগাড় করতে হবে, বাঁধতে হবে ঘর। আমরা সেখানে রচনা করবো আমাদের আনন্দের সুখনীড়।

মাধবী আহ্লাদে রবীনের বুকে মাথা এলিয়ে দিল। রবীন নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল মাধবীকে। আজ তাদের শুধু প্রেম আর ভালবাসা। স্বপ্ন আর সত্য, আনন্দের অপার তৃপ্তি।